বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 539. July, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৩৯ সংখ্যা। { আষাঢ়, ১৩১৫। জুলাই, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিস্ফোরক বিধি—কলিকাতার পুলিস কমিসনর আদেশ করিয়াছেন, অতঃপর কোন ডাক্তারখানায় নাইট্রিক এসিড, সলফিউরিক এসিড, পিক্রিক এসিড, পিক্রেটস্, নাইট্রল বেনজল, ক্লোরেট অব পটাস, গ্লিসারিন ও এসিটোন নামক অষ্ট প্রকার বিস্ফোরকের উপাদান বিক্রয় করিলে ক্রেতার নাম ধাম ও দ্রব্যের পরিমাণ লিখিয়া রাখিতে হইবে।

সাধু সঙ্কল্প—কলিকাতার উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের অধিবেশন সময়ে স্থিরীকৃত হয় যে, উক্ত সভা কর্তৃক উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের শিক্ষার জন্য বৎসরে ৫০০০৲ টাকা ও দরিদ্র বিধবা প্রভৃতির ভরণপোষণের জন্য বৎসরে ২০০০৲ টাকা ব্যয় করা হইবে। উক্ত সমাজ সমুদ্র-যাত্রার অনুকূলে এবং বাল্যবিবাহ ও পণগ্রহণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। দিনাজপুরের মহারাজা, কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ, কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ, রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়, শ্রীযুক্ত শরদিন্দু রায়, শৌরীন্দ্রমোহন সিংহ, তারকনাথ ঘোষ, প্রভৃতি মহোদয়গণ শিক্ষা ও দানের জন্য অর্থ সাহায্যে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

জৈনদিগের প্রতিবাদ—জৈনগণ সভা করিয়া পরেশনাথ পাহাড়ে ইংরাজদিগের স্বাস্থ্যাবাস নির্ম্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিবাদে কোন ফল না হওয়ায় সম্প্রতি ভারতের নানা প্রদেশে জৈনগণ সভা করিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, যদি পরেশনাথ পাহাড়ে স্বাস্থ্যাবাস নির্ম্মাণ প্রস্তাব বন্ধ করা না হয়, তাহা হইলে জৈনেরা বিলাতি দ্রব্যের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবেন।

রমণীর অধিকার—বিলাতের রমণীগণ পুরুষদিগের সমান অধিকার লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন এবং তজ্জন্য অনেক নির্য্যাতন এবং কারাদণ্ড পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন নাই। সম্প্রতি ইংলণ্ডের মন্ত্রী লর্ড জর্জের স্ত্রী লর্ড অন্‌শ্লোর স্ত্রী, লর্ড বেলফোরের স্ত্রী, আলফ্রেড লিটলটনের স্ত্রী, লেডী হেন্‌রী সমারসেট প্রভৃতি সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারীগণের নেতৃত্বে প্রায় দশ হাজার জমীদারপত্নী, মহাজনপত্নী, শিল্পীর পত্নী, শ্রমজীবিপত্নী টেম্‌স নদীতীরে সম্মিলিত হইয়া তথা হইতে নিশান উড়াইয়া বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে এলবার্ট হলে গমন করেন।

সংবাদপত্র আইন ও বোমা আইন—শিমলা শৈলে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে একই দিনে সংবাদপত্র ও স্ফোটনশীল দ্রব্য সম্বন্ধে দুইটী আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। এই আইন কোন সুপরিচালিত পত্রের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হইতে পারিবে না, কেবল যে সকল পত্র হত্যা প্রভৃতি করিতে লোকদিগকে উত্তেজিত করে, তাহাদিগের প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

সাহায্য প্রার্থনা—শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের মুক্তির জন্য সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা জন্মভূমির সেবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার মুক্তির জন্য যিনি যাহা কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, তাহা ৬নং কলেজ ষ্ট্রীটে উক্ত শ্রীমতী কিম্বা এটর্ণী মেসর্স ম্যানুয়েল আগরওয়ালার নিকট ৩নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট্ ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বিধবা-বিবাহ—গত সপ্তাহে কলিকাতায় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের দিয়াশলাইএর কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত ঢাকার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র নাগ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের বিধবা কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ড—মজঃফরপুরের বোমানিক্ষেপকারী ক্ষুদিরাম বসুর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। জজ বাহাদুর তাহাকে হাইকোর্টে আপিল করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

জীবতত্ত্ব বিষয়ে আর একটী গূঢ় কথা প্রহ্লাদ পিতাকে বলিয়াছিলেন, তাহা এই;—

"অন্যেষাং যো ন পাপানি চিন্তয়ত্যাত্মনস্তথা।
তস্য পাপাগমস্তাত! হেত্বভাবান্ন বিদ্যতে॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং করোতি যঃ।

তদ্বীজজন্ম ফলতি প্রভূতং তস্য চাশুভম্॥
সোঽহং ন পাপমিচ্ছামি ন করোমি বদামি বা।
চিন্তয়ন্ সর্ব্বভূতস্থমাত্মন্যপি চ কেশবম্॥
শারীরং মানসং দুঃখং দৈবং ভূতভবং তথা।
সর্ব্বত্র শুভচিত্তস্য তস্য মে জায়তে কুতঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)।

—যে জীব, অন্যের প্রতি পাপাচরণ অর্থাৎ অন্যকে দুঃখ দিব, অথবা নিজের প্রতি পাপাচরণ অর্থাৎ আপনাকে দুঃখ দিব,—এ কথা মনে জ্ঞানেও চিন্তা না করে, তাহার দুঃখোৎপত্তির কারণ না থাকায়, তাহার দুঃখোৎপত্তি হয় না।

—যে জীব, কার্য্যে, মনে বা বাক্যে পরপীড়াচরণ করে, সেই পরপীড়াচরণরূপ বীজ হইতে তাহার নিজের প্রভূত দুঃখরূপ অশুভ ফল ফলিয়া থাকে।

—হে পিতঃ! আমি কায়মনোবাক্যে পরপীড়াচরণ করি না। কেন না, ঈশ্বরকে আমি সর্ব্বভূত-মধ্যে এবং আত্মমধ্যে দর্শন করিতেছি—আমার চিত্ত যখন সর্ব্বত্রই কল্যাণময়, তখন আমার শারীরিক, মানসিক বা ভূতজনিত (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক) দুঃখ কোথা হইতে আসিবে?

পরদ্রোহস্পর্শশূন্য, সর্ব্বভূতকল্যাণময়, নির্ব্বিকার বুদ্ধ, চৈতন্য, হরিদাস, তুলসীদাস, প্রভৃতি মহাত্মাগণ কতবার সর্পব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর মুখে পতিত হইয়াছিলেন। হিংস্রজন্তুরা তাঁহাদের অনিষ্ট করে নাই। কেন না, তাঁহারা নির্ব্বিকার; তাঁহাদের স্বভাবে হিংস্রজীবের সজাতীয়তা বা সমধর্ম্মিতা ছিল না। সমধর্ম্মিতা না থাকিলে, একটী জীব অপরের প্রতি (শত্রুভাবেই হউক বা মিত্রভাবেই হউক) আকৃষ্ট হয় না, উদাসীনভাবেই থাকে। সর্পেরা বৃক্ষ প্রস্তরাদি দংশন করেনা, কেন না, জঙ্গমের ধর্ম্ম স্থাবরে প্রকটভাবে নাই (১)। অনেকে সমীপাগত কালসর্প দেখিয়া, কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিবং নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। সর্প আস্তে আস্তে তাঁহাদের কোলের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, দংশন করে নাই (২)। অনেক

(১) মনু প্রভৃতি প্রাচীনতম শাস্ত্রকারেরা বলেন;—বৃক্ষলতাদি স্থাবর পদার্থেও সংজ্ঞা অর্থাৎ চেতনা আছে। সেই সংজ্ঞা তমোগুণ-প্রভাবে প্রচ্ছন্ন। উত্তাপ ও জলসেকাদি দ্বারা তাহা লক্ষ্য করা যায়। উত্তাপে উহারা সঙ্কুচিত এবং জলসেকে প্রফুল্ল হয়। উহারা যে সুখ-দুঃখ অনুভব করে, তাহা ঐ সঙ্কোচ ও বিকাসাদি লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায়। এ তত্ত্ব আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের নবাবিষ্কার নহে।

"গুচ্ছগুল্মং তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ।
বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানা বল্ল্য এব চ॥
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥"

—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, গুচ্ছ, বল্লী, প্রতান, তৃণ প্রভৃতি স্থাবরাদি মধ্যে সংজ্ঞা আছে। উহাদেরও সুখ-দুঃখ-বোধ আছে। উহাদের মধ্যে সেই সংজ্ঞা বিচিত্র তমোগুণপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন। এজন্য হিন্দুশাস্ত্রে একটী তৃণেরও হিংসা করিতে নাই।

(২) খ্যাতনামা ৺ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতা ৺পণ্ডিত বিশ্বনাথ স্তায়পঞ্চানন মহাশয়

সময় দেখা গিয়াছে,—অজ্ঞান শিশু কালসর্প লইয়া খেলা করিয়াছে, কালসর্প শিশুর অঙ্গে জড়াইয়াছে, অথচ দংশন করে নাই। কেন-না, শিশুর স্বভাব নির্ব্বিকার। ভাবশুদ্ধিই সর্ব্বত্র সমতা ও নির্ব্বিকারতার মূল। ভাবশুদ্ধি বিনা সকল সাধনা বিফল হয়। তুলসীদাস বলিয়াছেন;—"প্রেম চাহিয়ে সাঁচ"— অর্থাৎ খাঁটি প্রেম চাই। প্রেমময় হৃদয়েই প্রেমময় হরির অধিষ্ঠান।

"ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্‌ভাবোহি কারণম্‌॥"

—কাষ্ঠে, পাষাণে বা মৃত্তিকায় নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে দেবতা নাই। ভক্তের ভাবময় হৃদয়েই দেবতার অধিষ্ঠান। সাধক কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত মূর্ত্তিতে যে দেবতা দর্শন করেন, তাহার কারণ, তত্তৎকালে সাধকের ভাবময় হৃদয় ঐ সকল মূর্ত্তি মধ্যে প্রতিফলিত হয়। স্বচ্ছ দর্পণ মধ্যে প্রতিফলিত নিজ প্রতিবিম্বের ন্যায়, সাধক ঐ সকল মূর্ত্তি মধ্যে নিজেরই দেবভাবযুক্ত হৃদয় দর্শন করেন। এ সত্য অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে। শ্রীক্ষেত্রে গিয়া কেহ জাজ্বল্যমান জগন্নাথ দর্শন করেন, কেহ বা জগন্নাথের পরিবর্ত্তে পূতিকাষ্ঠ (পুঁইমাচা) দর্শন করেন। যাহার যেরূপ ভাবনা, সে তাহাই দেখে। আমি ৺গয়াধামে গিয়া স্বর্গীয় পিতামাতার পিণ্ডদানের সময়, গদাধরপাদপদ্মে তাঁহাদের জলন্তমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলাম। এরূপ ঘটনা অনেকের ঘটিয়া থাকে।

মিষ্টাদির স্বাদগ্রহবিষয়ে আস্বাদ্য ও আস্বাদক উভয়েরই গুণ ও পরস্পর সংযোগ চাই। রসনার স্বাদগ্রাহিতা সত্ত্বেও, যদি আস্বাদ্য বস্তুতে কোনও রস না থাকে, তবে স্বাদগ্রহ হয় না। আবার, আস্বাদ্য বস্তুতে রস থাকিলেও, যদি তাহাতে রসনাযোগ না হয়, তবে স্বাদগ্রহ হয় না। সেইরূপ, ধ্যাতা ও ধ্যেয় উভয়েরই গুণ ও পরস্পর সংযোগ চাই। যদি বল, কাষ্ঠ প্রস্তরাদি মূর্ত্তিতে তো প্রকৃত দেবত্ব নাই, তবে তদ্দর্শনে লোকের ভাবোদ্রেক হয় কেন? এ বিষয়ে আমার এইরূপ বিশ্বাস, যে, জড়তীর্থাদিতে ও দেব-বিগ্রহাদিতে দেবত্ব না থাকিলেও, সে সকলের এক অনির্ব্বচনীয় উদ্দীপনী শক্তি আছে। যুগ-যুগান্তর হইতে কোটি কোটি ভক্তের প্রেমোচ্ছলিত স্তব-স্তুতি, প্রার্থনা ও প্রাণের উচ্ছ্বাস, ঐ সকল তীর্থে ও মূর্ত্তিতে গাঢ়ভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে। ঐ সকল স্থানের ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, সমস্ত পদার্থই ভক্তবৃন্দের পবিত্র ভাবোচ্ছ্বাসে ভাবময় হইয়া আছে। যত ভক্তের হৃৎ-কণ্ঠ ভেদ করিয়া যতগুলি শব্দ বাহির হইয়াছে, ফনোগ্রাফ-যন্ত্রে শব্দরেখার ন্যায়, ঐ স্থানের আকাশপটে

নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিয়া কালসর্প হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

(ইথারে-Ether) সেই সেই শব্দ ততগুলি তরঙ্গ বা রেখা (Impression) অঙ্কিত করিয়াছে। শব্দ নিত্য, শব্দের ধ্বংস নাই। ঐ সকল ভাবাত্মক শব্দ দর্শকের হৃদয়ে অব্যক্তভাবে এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ করে। অতএব তীর্থ বা দেব-মূর্ত্তির স্থানে গমন করিলে এবং ঐ সকল দর্শন করিলে, লোকহৃদয়ে যে দেবভাব জাগ্রত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। সর্ব্ব-ভূতেই তো সেই বিশ্বান্তরাত্মা গূঢ়ভাবে রহিয়াছেন। দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা বিশেষ কেবল উদ্বোধক মাত্র।

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥"
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)।

ঋষিকল্প ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বৈদ্যনাথে অবস্থানকালে আমাকে বলিয়া-ছিলেন,—"ভাই! বৈদ্যনাথমন্দির ও উহার চতুষ্পার্শ্ব, বহুকালাবধি কোটি কোটি ভক্তের ভাবোচ্ছ্বাসে মঞ্জুল্ হইয়া আছে। আমি অপৌত্তলিক হিন্দু; কিন্তু ঐ স্থানে গমনমাত্র কি এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে ঢলিয়া পড়ি! তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি না।

ভাবশুদ্ধি বিনা সকল সাধনাই নিষ্ফল হয়। ভাবশুদ্ধি স্পর্শমণি। ইহার স্পর্শে লোহও সুবর্ণ হয়। বিষও অমৃত হয়। আবার দূষিতভাবে গ্রহণ করিলে অমৃতও বিষ হইয়া যায়। একটী প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঘটনাটী এই;—আমার কোনও আত্মীয়ার একমাত্র কন্যা। ঐ কন্যাই তাঁহার সর্ব্বস্বধন। ঐ কন্যা, একটী মৃতশিশু প্রসবের পর, ভীষণ জ্বরবিকারে ও অন্যান্য অসাধ্য রোগে মুমূর্ষু-শয্যায় পতিতা। বড় বড় সাহেব ডাক্তার তাহার চিকিৎসায় নিযুক্ত। ডাক্তার দুইপ্রকার ঔষধ দিয়াছেন; একটী ভক্ষণের ও অপরটী মালিসের জন্য। মালিসের ঔষধ বিষাক্ত; তাহা ভক্ষণ করিলে মৃত্যু অবধারিত। কন্যার মাতা, কন্যার প্রাণরক্ষার জন্য ভগবানে তন্ময় হইয়া আরোগ্য কামনা করিতেছিলেন। ঔষধসেবনের সময়ে তিনি ভ্রমক্রমে সেই বিষাক্ত মালিসের ঔষধ সমস্তটুকু কন্যাকে সেবন করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কন্যা সংজ্ঞাশূন্য হইল। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আসিল, দেখিল;—কন্যাটীর শেষ দশা, পার্শ্বে মালিসের খালি সিসিটী পড়িয়া আছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, প্রসূতির ভুলেই এ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। ব্যাপার বুঝিয়া, প্রসূতি মর্ম্মভেদী করুণস্বরে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। বলিলেন,—হে দয়াময়! হে নারায়ণ! তুমি জানিতেছ অমৃত ভাবিয়াই আমি বিষ দিয়াছি। আমার কন্যা মরিলে, আমিও প্রাণত্যাগ করিব। প্রসূতির পাষাণভেদী কাতরতায় সকলেই অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন রাত্রি শেষ হইয়াছে। ডাক্তারেরা রোগিণীর পার্শ্বে বসিয়া আছেন, হঠাৎ রোগিণী

অল্পে অল্পে চক্ষু মেলিল। তাহার নাড়ীতে স্পন্দন ও দেহে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। দেখিয়া সকলে অবাক্! তাহাকে আর কোনও ঔষধ দেওয়া হয় নাই। কন্যাটী জীবন পাইল।

যখন আধ্যাত্মিক সমস্ত উৎকর্ষ ভাব-শুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন ভাবনার বা ধ্যানের মূলবস্তুটী কিরূপ পবিত্র ও কত উচ্চ হওয়া উচিত, তাহা বলিয়া জানান যায় না। আদর্শ যত উৎকৃষ্ট হইবে, তদনুসরণের ফলও তত উৎকৃষ্ট হইবে। নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান সাধারণের পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই, সগুণ ও সাকারের ধ্যান প্রচলিত হইয়াছে। যাঁহারা গুরুর নিকট ইষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সাধনার দুইটী প্রধান অঙ্গ—জপ ও ধ্যান।—"জপাৎ শ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাৎ শ্রান্তঃ পুনর্জপেৎ।" দীক্ষিত শিষ্য জপ করিতে করিতে শ্রান্তিবোধ করিলে, ধ্যান করিবে, এবং ধ্যান করিতে করিতে শ্রমবোধ করিলে পুনরায় জপ করিবে। তন্ত্রাদিশাস্ত্রে শিব, কালী, সীতা, রাম, রাধা, কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা দেব-দেবীর ধ্যান দৃষ্ট হয়। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে,—কতকগুলি বীভৎসরুচি তান্ত্রিক স্বরচিত তন্ত্রে এরূপ কুৎসিত কথা লিখিয়াছেন যে, তদনুসরণে লোকের অধঃপাত অবশ্যম্ভাবী (১) কেহ কেহ তন্ত্রোক্ত মদ্য-মাংস-মৈথুনের ভিতর গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব দর্শন করেন, এবং ঐ সকল বীভৎস কাণ্ডের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু উহাদ্বারা লোকসমাজের যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। মনুষ্য হউক বা কীট পতঙ্গ হউক, তন্মনা হইয়া যে যেরূপ ভাবনা করিবে, সে ঠিক্ সেই ভাবাপন্ন ও সেই অবস্থাপন্ন হইবে।

বিশ্বাসের একাগ্রতা, মনের তন্ময়তা জন্মিলে, মনুষ্য সুতীক্ষ্ণ বিষের শক্তিকেও পরাজয় করিতে পারে, নানা অসাধ্য রোগ হইতেও পরিত্রাণ পাইতে পারে। আবার, বিপরীত দিকে সেইরূপ একাগ্রতা জন্মিলে, মনুষ্য নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়, মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। এ বিষয়ে দৃষ্ট ও শ্রুত অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সকল ঘটনা জানা থাকিলে, সময়ে সাবধান হইয়া অনেকে মহোপকার লাভ করিবেন বলিয়া এ স্থলে কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। বঙ্গবাসী আফিসের কর্ম্মচারী শ্রীমান্ উমেশ চন্দ্র দত্ত আমার নিকট এই ঘটনাটী বলিয়াছেন;—"আমার আত্মীয়া রাত্রিকালে নিদ্রিতা ছিলেন। সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, আমার পায়ে বুঝি কি কামড়াইল। আমরা সকলে উঠিয়া, শয্যা ও ঘরের চারিদিক তন্ন

(১) যে সকল অশ্লীল কাণ্ড, বোধ করি, সুরামত্ত ইতর জাতীয় ব্যক্তি, সুরামত্তা বেশ্যার মঙ্গেও করিতে অক্ষম।

তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম, কিন্তু কোনও স্থানে সর্প বা বৃশ্চিক বা অন্য কোনও জীব খুঁজিয়া পাইলাম না। ইষ্টকনির্ম্মিত সুন্দর মসৃণ কোটা ঘর, কোনও স্থানে ছিদ্র বা গর্ত্ত ছিল না। তাঁহার পায়ে দংশনের কোনও চিহ্নও আমরা দেখিলাম না। নিকটস্থ দুই একজন ওঝা আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল যে, সর্পাঘাত নহে। আমরাও দেখিলাম যে, তাঁহার শরীরে বিষের লক্ষণ কিছুমাত্র নাই। তখন আমরা সকলে মনে করিলাম যে, ডেও পিঁপড়া তাঁহার পায়ের মাংস চিমটিয়া লইয়াছিল। আমার আত্মীয়াও সেইরূপ মনে করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা গেলেন।

(ক্রমশঃ)

হারানিধি।

গ্রীষ্মের ছুটীতে কলেজ বন্ধ হইয়াছে। বাটী যাইবার জন্য পিতার জরুরী পত্র আসিয়াছে। কারণ আমার বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে। আমার যাইবার প্রতীক্ষা মাত্র; তাই আজ মেসের বন্ধু বান্ধবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বেলা সাত ঘটিকার সময় নৌকারোহণে বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

হরদিয়া জেলার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে আমার নিবাস, এ অঞ্চলে তখনও রেল খুলে নাই। আমরা নৌকারোহণে যাতায়াত করিতাম, কিন্তু বিশেষ কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। প্রাতঃকালে যাত্রা করিলে, সন্ধ্যার সময় বাটী পৌঁছান যাইত। আমি মনের আনন্দে নদীর চারিধারের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। কোথাও বা বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, রাখাল বালকেরা গরুগুলিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে এবং মনের আনন্দে কেহ বা গীত গাহিতেছে, কেহ বা মুড়ি খাইতেছে। কোথাও বা গ্রাম্য বধূরা অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া, বারিপূর্ণ কলসী কক্ষে থমকে থমকে হেলিতে দুলিতে গ্রাম অভিমুখে যাইতেছে। দূর কাননের অন্তরাল হইতে দু একটা কোকিল এক এক বার কুহু ধ্বনিতে হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। নানা বর্ণের পক্ষী সকল কলরব করিতে করিতে নদীর উপর দিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে।

মাঝিরা সব সারি গাহিয়া চলিয়াছে, এবং ক্ষিপ্র হস্তে ক্ষেপণী চালনা করিতেছে। ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল; মার্ত্তণ্ডদেবের সে প্রচণ্ড তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, নৌকার ছত্রীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠে মনোনিবেশ করিলাম। পুস্তক পড়িতে পড়িতে কখন যে নিদ্রা-

দেবীর কোমল অঙ্কে আশ্রয় লইয়াছি তাহা স্মরণ নাই। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকা। যতই বাটীর নিকটবর্ত্তী হইতেছি, ততই যেন আমি আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেছি। কতক্ষণে স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী জননী এবং প্রিয়তম সহোদরকে দেখিব যতই ভাবি, ততই যেন আনন্দে আমি অধীর হইয়া পড়ি; কিন্তু আমার এ ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটিল। সহসা পশ্চিম গগনে ক্ষুদ্র এক খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিল। সেই মেঘ ফুলিয়া ফুলিয়া, ক্রমশঃ সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ঘন ঘোর আঁধারে সমস্ত জগৎ যেন কি বিকট ভাব ধারণ করিল। নদীর চঞ্চল লহরীমালা মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া গেল। বৃক্ষের পত্রটী পর্য্যন্ত নড়িতেছে না, সমস্ত নীরব নিস্তব্ধ। সহসা ভীষণ বেগে বায়ু প্রবাহিত হইল। প্রকাণ্ড গাছ পালা আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। মেঘের কোলে সৌদামিনী ঘন ঘন হাসিতে লাগিল। গভীর নিনাদে মেঘ গর্জ্জন করিতে লাগিল। নদীর তরঙ্গমালা রঙ্গে ভঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল। প্রকৃতি প্রলয়ের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন জগৎসংহারে উদ্যত। তখন আমার প্রাণের ভাব কি প্রকার তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহা কি আর পাঠকবর্গকে বলিয়া দিতে হইবে? "আল্লার নাম নাও। আমার যতক্ষণ জ্ঞান আছে, তোমার কোন ভয় নাই।" আমি মাঝির এ আশ্বাসবাক্যে মনকে প্রবোধ দিতে পারিলাম না। সেই একমাত্র বিপদে চিন্ময় চিদানন্দ শ্রীমধুসূদনের নাম আবেগভরে জপ করিতে লাগিলাম। এক একটা প্রবল তরঙ্গ আসিয়া আমার তরঙ্গখানি ডুবাইবার চেষ্টা করিল। সুনিপুণ মাঝির সুকৌশলে চালনায় ও একমাত্র দয়াময়ের কৃপায় সেই প্রলয়ের মধ্যে আমার নৌকাখানি ডুবু ডুবু হইয়াও ডুবিল না। কিন্তু সহসা আমি যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমার নিজের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। দেখিলাম, আমাদের চারি পাঁচ হস্ত দূরে একখানি তরণী প্রবল ঝটিকাঘাতে মগ্নপ্রায়। কর্ণধার কোনমতে নৌকা সামলাইতে পারিতেছে না। আর রক্ষা নাই, গেল—গেল—একটাঃ হৃদয়ভেদী, আর্ত্তনাদের সহিত তরীখানি অতল জলে নিমগ্ন হইল।

যখন আমার চক্ষের উপর এই ভয়াবহ দৃশ্য ঘটিল, তখন আমি নীরব নিশ্চল —বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ক্ষণেকের নিমিত্ত আমার নয়নদ্বয় মুদ্রিত হইয়া গেল। যখন চক্ষু চাহিলাম, সেই জলমগ্ন নৌকার কিছুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না, কেবল উত্তাল তরঙ্গমালা উঠিয়া পড়িয়া উল্লম্ফন করিতেছে। কিন্তু পরক্ষণে বিদ্যুৎ সাহায্যে দেখিলাম, আমার নৌকার অতি নিকটে কি যেন একটা পদার্থ ভাসিয়া উঠিল। তখন নিজের প্রাণের

মায়া পরিত্যাগ করিয়া, ঝম্প প্রদানের উদ্যোগ করিলাম। কর্ণধার "কি কর বাবু? কি কর বাবু?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু আমি সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া নদীবক্ষে ঝম্প প্রদান করিয়া সেই পদার্থটা অতিকষ্টে ধরিয়া ফেলিলাম। দাঁড়ি মাঝিরা আমার এই কাণ্ড দেখিয়া, হতবুদ্ধি না হইয়া বরং আমার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইল। অতি কষ্টে আমাকে ও সেই পদার্থটাকে কৌশল পূর্ব্বক নৌকার উপর তুলিয়া লইল। তখন ঝটিকার বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। আমি ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোকসাহায্যে দেখিলাম, যাহার উদ্ধারের জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছিলাম, সে একটী দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা। বালিকা অঘোর অচৈতন্য; কিন্তু অল্প অল্প নিশ্বাস পড়িতেছে। শুশ্রূষা করিলে বাঁচিতে পারে এই আশায় আশান্বিত হইয়া, উদরস্থ জল যে কৌশলে বাহির করিতে হয়, সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলাম। অনেকটা জল বহির্গত হইয়া গেল। কৌশলপূর্ব্বক তাহার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া, একখানি শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া দিলাম এবং বালিকার ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি সযত্নে স্বহস্তে মুছাইয়া দিলাম। আ মরি মরি! বালিকার কি নয়ন মুগ্ধকর রূপরাশি! যেন কতকগুলি সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের সমষ্টি। আকর্ণ বিস্ফারিত নয়ন দুটী নিমীলিত; মুখখানি যেন প্রভাত-কমলের ন্যায় চল চল করিতেছে। পাঠকগণ, আমার প্রতি বোধ হয় বড়ই চটিয়াছেন। তাঁহারা হয়ত বলিতেছেন, এ লোকটা কে গো? বালিকাটী মরিতে বসিয়াছে, কোথায় তাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে, না লোকটা কিনা রূপ বর্ণনা করিতে বসিল। পাঠকবর্গ! সত্যই আমার বড় অন্যায় হইয়াছে, আমার এই প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন। আমি আর তার রূপের কথা বলিব না।

তখন অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বালিকাকে অল্প অল্প তাপ দিতে দিতে তাহার সেই হিমানীতুল্য শীতল গাত্র অল্প অল্প উষ্ণ হইল। এদিকে প্রকৃতির অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। প্রকৃতির আর সে প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি নাই। নীলাকাশে শশধর অসংখ্য তারকাহারে বিভূষিত হইয়া মধুর হাসি হাসিয়া, জল, স্থল, কানন প্লাবিত করিতেছে। স্নিগ্ধ সমীরণ ফুল পরিমল বহিয়া জগৎ মুগ্ধ করিতেছে। মধুর কূজনে বিহঙ্গকুল কানন প্রতিধ্বনিত করিতেছে। ফুলকুল হাসিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে সোহাগে ঢলিয়া পড়িতেছে। তরঙ্গিনী নক্ষত্রমালা বুকে ধরিয়া মৃদু মন্দ বেগে বহিয়া যাইতেছে। প্রকৃতি এখন শান্তিময়ী।

ক্রমে ক্রমে তরী আসিয়া গোপালপুরের ঘাটে পৌঁছিল। বালিকার কিন্তু সেই একই ভাব—অঘোর অচৈতন্য। সে রাত্রে আর বাটী যাওয়া হইল না। মাঝিকে বিশেষ পুরস্কৃত করিব বলিয়া,

তাহার নৌকাতে সে রজনী সেই ঘাটে অবস্থান করিলাম। কেন জানিনা এক-বারও নয়ন মুদিত না করিয়া, বালিকার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিলাম। যে মুহূর্ত্তে সেই প্রথম দেখা—সেই অনন্ত মুহূর্ত্ত হইতে তড়িৎশক্তি সহযোগে কি যেন কি একটা ভাব আমার হৃদয়কমলকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। এ জীবনে এ ভাবটা এই নূতন—কিন্তু এটা কি তা তখন বুঝিতে পারিলাম না।

রাত্রি প্রভাত হইল। গগনের পূর্ব্ব দ্বার খুলিয়া, নবোঢ়া বধূর ন্যায় ধীরে ধীরে হাস্যমুখী উষাসতী দেখা দিল। বিহঙ্গকুল মধুর সঙ্গীতে জগৎ প্লাবিত করিয়া দিননাথের আগমন বার্ত্তা বিঘোষিত করিতে লাগিল। প্রভাত সমীর নাচিয়া নাচিয়া নদী বক্ষে উর্ম্মি লইয়া খেলা করিতে লাগিল। কখন বা কুসুম-বালার অধর চুমিয়া চুপি চুপি পলায়ন করিতেছে; কখন বা নৌকার ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে প্রবেশ করিয়া সেই অচৈতন্য বালিকার গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিত অলকারাশি লইয়া খেলা করিতেছে। সেই শীতল সমীরণ স্পর্শে বালিকা একবার নয়ন উন্মীলিত করিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই কোমল কমল আঁখি দুটী নিমীলিত হইল। আমার হৃদয়ে এবার আশার সঞ্চার হইল। তাহার সেই অনাঘ্রাত-ফুল্লনলিনীতুল্য মুখের প্রতি একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পরে বালিকা আবার চাহিল। এবার তাহার দৃষ্টি আমার প্রতি পতিত হইল। বালিকা বিস্মিত নয়নে একবার চারিদিকে চাহিয়া, বীণাবিনিন্দিত স্বরে বলিল, "আমি কোথায়?" আমি তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, "তুমি উত্তমস্থানে আছ, কোন ভয় নাই।"

বালিকা কিছুক্ষণ যেন কি ভাবিল, পুনরায় মধুর স্বরে বলিল, "আমার মা আমার বাবা কোথায়?" বালিকার কথার ভাবে বুঝিলাম, সেই নৌকায় তাহার পিতা মাতা ছিলেন। কিন্তু এখন আমি কি বলি, তাহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে যদি তাহার পিতা মাতার কোন সন্ধান পাই নাই বলি, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপদের সম্ভাবনা। আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, শেষে সত্য কথাই বলিব স্থির করিলাম। আমি তাহাকে যে প্রকারে উদ্ধার করিয়াছি, সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলিলাম, "তোমার পিতা মাতা বোধ হয় তোমার ন্যায় অপর কোন লোকের সাহায্যে উদ্ধার পাইয়াছেন।" বালিকা কিন্তু আর কোন কথা বলিল না। নীরবে তাহার দুইটী গোলাপী গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল। আমি তাহাকে বিধিমতে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে কাহার কন্যা, বা কোথায় নিবাস, এবং কোথায় বা যাইতেছিল, সাহস করিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। বালিকা

ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। নবোদিত তরুণ অরুণকিরণ, চঞ্চল নদীবক্ষে পড়িয়া যে শোভা বিস্তার করিতেছিল বালিকা তাহাই নৌকার গবাক্ষপথে ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিতেছিল। অনেক পরে বলিলাম, "তুমি আমার সহিত আমাদের বাটী চল, তাহার পর যথাসাধ্য তোমার পিতা মাতার অনুসন্ধান করিব।" বালিকা আমার এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব। একটা কিছু বলিয়া ত সম্বোধন করিতে হইবে।" বালিকা লজ্জাবনত মুখে বলিল, "উমা বলিয়া ডাকিবেন।" আমি তাহার সেই ব্রীড়াবিজড়িত সুন্দর মুখখানি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তাহার পর একখানি শিবিকা আনাইয়া, উমাকে তাহাতে তুলিয়া দিয়া, মাঝিকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিয়া শিবিকার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের বাটী আসিয়া পৌছিলাম।

বহির্ব্বাটীতে তখন পিতা ছিলেন না, আমি শিবিকাসহ অন্দরমহলে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই মাতাঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া, স্নেহমাখা মধুর স্বরে বলিলেন, "বাবা অমিয়! এতক্ষণ পরে এলি? কাল তোর আসিবার কথা ছিল। কিন্তু কাল যে দুর্যোগ গেছে, আমি পাগলের মত একবার ঘর, একবার বার করিতেছি, আমাতে আর আমি ছিলাম না। তা যা হোক, তোর কোন বিপদ হয় নাই ত? তোর সঙ্গে আবার পাল্কী কেন?"

আমি তখন কল্যকার ঘটনা সমুদয় বিবৃত করিলাম। মা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এমন পাগল ছেলে ত কখন দেখিনি. ভাগ্যে মা জগদম্বা মুখ তুলে চেয়েছেন তাই রক্ষে।" তাহার পর শিবিকার দ্বার খুলিয়া উমার হস্ত সযত্নে ধরিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমিও পিতামহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বহির্ব্বাটীতে গমন করিলাম।

(ক্রমশঃ)

কাশ্মীর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় কোহালায় পৌছিলাম। এখানে রাস্তা বেশ প্রশস্ত। রাস্তা হইতে প্রায় ৮।১০ ফিট নিম্নেই বিতস্তা প্রবলবেগে ছুটিতেছে। রাস্তার বাম পার্শ্বে পাহাড়ের গাত্রে কয়েকখানি আটা, ঘৃত, লবণ, মোটা চাউল প্রভৃতির ক্ষুদ্র দোকান। দোকানঘরগুলি কাঠের দোতালা। নিম্নে দোকান, উপরে যাত্রী এবং দোকানদারদিগের থাকিবার ঘর; ইহাই কোহালার বাজার।

রাস্তার একদিকে কতকগুলি গো-শকট রহিয়াছে, নিরীহ গরুগুলি অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে রোমন্থন করিতেছে। তিন চারিখানি টঙ্গা ও ঘোলা রহিয়াছে দেখিলাম।

বাজার হইতে অনেক উচ্চে এবং সেই পাহাড়েরই একটী সানুদেশে ডাক্‌বাঙ্গলা অবস্থিত। নিচে টঙ্গা খুলিয়া দিয়া রাত্রি যাপনোদ্দেশে ডাক্‌বাঙ্গলায় যাইলাম। সেখানে যাইয়া দেখি সমস্ত ঘরেই শ্বেতাঙ্গ বিরাজ করিতেছে। সম্মুখের হলে সান্ধ্য ভোজন চলিতেছে, কাঁটাচামচের এবং প্লেটের ঠন্‌ঠন্ শব্দ হইতেছে, সাদা পাগ্‌ড়ি-মাথায় চাপরাসিরা হন্‌হন্ করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। আমরা দেখিলাম মহা বিপদ! দুই চারিবার চাপরাসী, চাপরাসী, বলিয়া ডাকিলাম, কে কার কথা শুনে? তখন তাহারা ডিনার রূপ মহাসমরে সহায়তা করিতেছে, সুতরাং শুনিয়াও শুনিল না। কিয়ংক্ষণ পরে,যখন দেখিল এক হ্যাটধারী তাহাদিগকে ডাকিতেছে, তখন এক জন আসিয়া, "সাহেবের কি হুকুম" জিজ্ঞাসা করিল।

আমি বলিলাম, "কামরা খালি হায়"? চাপরাসী নিকটে আসিয়া দেখিল, কালা আদ্‌মী,সিংহ চর্ম্মাবৃত শৃগাল,তখন সগর্ব্বে, —"নেহি হায়, সাহেব-লোক্ সব্ লে লিয়া"—এই কথা বলিয়া কালা আদমির প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় আমার বন্ধু অগ্রসর হইয়া কহিল,—"চাপরাসীজি, কুছ্ বক্‌সিস্ মিল্ যায়ে গা, একঠো কাম্‌রাকো বন্দোবস্ত্ কর্ দেও। এত্‌না রাত্‌মে কাঁহা যায়গা"।

চাপরাসী পুঙ্গব তখন বক্‌সিসের কথা শুনিয়া একটু নরম হইয়া কহিল,—"কেয়া করেগা হুজুর, কামরা তো হ্যায় নেহি, একঠো তাঁবু থা, উহ্ এক পার্সি সাহেব লে লিয়া; আপ্‌লোক্ বারান্দা পর রহেঙ্গে?"

আমি ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশ! এই হিমে, জঙ্গলের মধ্যে বারান্দায় থাকিব কি করিয়া? ইহা অপেক্ষা বাজারের অপরিকার গৃহে থাকা ভাল। তখন আমি বলিলাম,"বারান্দা পর্‌ সুবিস্তা নহি হোগা" বলিয়া চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছি, তখন চাপরাসী বলিল, "আচ্ছা থোড়া ঠারিয়ে—হাম্ আবি আতা হ্যায়।"

পাঁচ সাত মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া চাপরাসী বলিল, "হুজুর বহুৎ মুস্কিল্‌সে একঠো কামরা আপ্‌লোগন্‌কো লিয়ে বন্দোবস্ত্ কিয়া—এক সাহেব রাৎমে পৌঁছ্‌নে কো বাত হ্যায়, উহ অভি আয়া নহি—উস্ কাম্‌রামে আপ্‌লোক শো যাইয়ে। আউর হামরা উপর মেহেরবানি করকে বক্‌সিস্‌ঠো—"

"আচ্ছা হো যায়গা" বলিয়া কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, ঘরটি অতি ক্ষুদ্র, একখানি খাটিয়া পাতা আছে, একটি ছোট আল্‌না, দেওয়ালে একটি কেরো-সিনের ল্যাম্প টাঙ্গানো। ঘরের পার্শ্বেই একটি গোসলখানা। চাপরাসি আর দুই খানা খাটিয়া আনিয়া দিল, কিন্তু উহা

বিছাইবার স্থান দেখিলাম না, বরং যে চারপাই খানি পাতা ছিল, তাহাও বাহির করিয়া দিয়া—সতরঞ্চি বিছাইয়া বিছানা করিয়া খাবারের হাঁড়িটি খুলিয়া জলযোগের আয়োজন করিতেছি, এমন সময় চাপরাসী পুঙ্গব আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কুছ খানা লে আয়েগা ? আমরা বলিলাম, "নেহি"। তখন সে নিশ্চয়ই আমাদিগকে অদ্ভ বিশেষ ভাবিয়া চলিয়া গেল। জলযোগ সমাপ্ত করিয়া সে রাত্রের মত আশ্রয় পাইলাম বলিয়া ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া শয়ন করিবার উদ্‌যোগ করিতে যাইয়া দেখি যে ইতিমধ্যেই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুটি তাঁহার বিশালবপু দ্বারা মহীরাবণের ন্যায় সেই প্রকোষ্ঠের বার আনা ভাগ দখল করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। পার্শ্বে অপর বন্ধুটি শয়ন করিলেন, আমি অতি কষ্টে যে স্থান টুকু ছিল তাহাতে শয়ন করিলাম। কিন্তু নিদ্রা হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার অপর বন্ধুটি শয্যা স্পর্শ করিবামাত্র যে ভয়ঙ্কর নাসিকাগর্জ্জন আরম্ভ করিলেন, তাহাতে চক্ষু বুজিতে পারিলাম না, নিদ্রা ত দূরের কথা। যাহা হউক, আমি ত সে রাত্রি কোনরূপে সেই কোলাহল মধ্যে যাপন করিলাম। কিন্তু আমার ভৃত্য বেচারার দুর্দ্দশা আমাপেক্ষাও শোচনীয়। সেই হিমে সে বাহিরেও শয়ন করিতে পারিল না; প্রকোষ্ঠ মধ্যে তাহার প্রভুই শয়নের স্থান পায় না, সে ত দূরের কথা। অবশেষে সে সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ক্ষুদ্রতর গোসল-খানার আসবাববিশেষ সরাইয়া সে রজনী যাপন করিল।

(ক্রমশঃ)।

আর্য্যদিগের রন্ধনশালা ও ভোজনস্থানাদি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রন্ধনগৃহ কিরূপ হওয়া উচিত ও ভোজনদ্রব্যাদি কিরূপে রাখিতে হয়, ও রাজগণের অন্ন রাজচিকিৎসকগণকে পক্ক অন্নের কিরূপে বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আর্য্যঋষিগণের সংক্ষিপ্তো-পদেশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ;

আপ্তাম্বিতমসংকীর্ণং শুচিকার্য্যং মহানসম্।
তত্রাবৈদ্যগুণসম্পন্নমন্নং ভক্ষ্যং সুসংস্কৃতম্।
শুচৌ দেশে সুসংগুপ্তং সমুপস্থাপয়েদ্ভিষক্॥
বিষঘ্নৈরগদৈঃ স্পৃষ্টং প্রোক্ষিতং ব্যজনোদকৈঃ।
সিদ্ধৈর্ম্মন্ত্রৈর্হতবিষং সিদ্ধমন্নং নিবেদয়েৎ॥

(সুশ্রুতসংহিতা)

অনুবাদ। রন্ধনগৃহটী বিশ্বস্তজনসমন্বিত (অর্থাৎ যাহারা শত্রুগণের উৎকোচবশীভূত হইয়া ও গোপনে বিষপ্রয়োগ দ্বারা অন্ন দূষিত না করে, বা সহসা কোন কারণাধীন দোষযুক্ত অন্ন আহার করিতে না দেয়, এইরূপ জ্ঞানী আত্মীয়াদি বিশ্বস্ত

লোক যেখানে থাকেন, এইরূপ , অসং-কীর্ণ (ক্ষুদ্র না হয়, বায়ু গমনাগমনের পথ রোধক না হয় বা গবাক্ষ বির্জিত না হয় এইরূপ) ও শুচি (যাহা উত্তম রূপে মার্জ্জনলেপনাদি করা হইয়াছে, যেখানে আবর্জ্জনা নাই, যেখানে অন্ত্যজজাতি বা কুকুর বিড়ালাদি প্রাণী দৃষ্টিদোষ বা স্পর্শদ্বারা খাদ্যে দোষ না ঘটাইতে পারে, ইত্যাদি প্রকারের পবিত্র সে স্থান হওয়া উচিত।) বিশ্বস্ত লোকসকল কর্ত্তৃক গুণসম্পন্ন যেরূপ ভাবে যে পদার্থ দ্বারা রন্ধন নিষ্পন্ন হইলে ভাল হয় সেইরূপ), সুসংস্কৃত (অর্দ্ধপক্ক ও অতিরিক্ত পক্ক না হয় অর্থাৎ পাকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যথানিয়মে সংস্কার বিশুদ্ধ হয়, এইরূপ ভক্ষগোপযোগী দ্রব্য পবিত্র স্থানে সুসংগোপনে রাখিবে অর্থাৎ ঢাকিয়া রাখিবে, যেন দূষিত পদার্থ পড়িয়া বা কুকুর বিড়ালাদি স্পর্শ করিয়া দোষ না ঘটায়। রাজচিকিৎসকগণ রাজাদিগের জন্য স্থাপিত এইরূপ অন্নে বিষঘ্ন ঔষধ স্পর্শ করাইবেন এবং বিষনাশক জলে ব্যজন ক্ষালিত করিয়া তদ্দ্বারা অন্ন বীজন করিবেন এবং সিদ্ধ মন্ত্র (বিষনাশক অবশ্য ফলপ্রদ ও বহু সাধনাসিদ্ধ মন্ত্র) সকল পাঠ করিবেন। এইরূপ করিলে অন্নের দোষ নষ্ট হয়। এইরূপ অন্নই রাজাকে নিবেদন করিবে।

উল্লিখিত প্রকারে বিশুদ্ধ রন্ধনশালায় বিশুদ্ধভাবে পক্ক ও রক্ষিত অন্ন কিরূপ স্থানে বসিয়া কিরূপে আহার করিবে তাহার নিয়ম এই ;—

উপলিপ্তে শুচৌ দেশে পাদৌ প্রক্ষাল্য
যত্নতঃ।
প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত শুচিঃ পীঠমবস্থিতঃ॥
(শংকরসংহিতা মহাতন্ত্রম্।)

অনুবাদ। যে স্থান গোময়াদি দ্বারা উপলিপ্ত হইয়াছে এবং যে স্থান পবিত্র, এইরূপ আহারোপযোগী স্থানে পবিত্র হইয়া পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া পীঠ অর্থাৎ পিঁড়া প্রভৃতি আসনের উপর পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিয়া অন্ন আহার করিবে।

আহারাদি সম্বন্ধে অন্যান্য নিয়ম অন্য প্রবন্ধে কিছু বিশেষভাবে বলিবার ইচ্ছা থাকিল। শাস্ত্র পাঠ করিলে বোধ হয় যে রন্ধনগৃহ অপেক্ষা ভোজনস্থান যেন আরও বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। এই জন্যও বোধ হয় রন্ধনগৃহ ও ভোজনস্থান পৃথক্ হওয়ার নিয়ম ছিল। কিরূপ পবিত্র স্থানে বসিয়া ভোজন করা ভাল, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম আছে ;—

দেবালয়ে যাবতীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে চ শঙ্করি!
ব্রাহ্মণানাং সমাজে তু ভুক্ত্বা ক্রতুফলং
লভেৎ॥
(মৎস্যসূক্তমহাতন্ত্রম্।)

অনুবাদ। হে শঙ্করি! দেবালয়, তীর্থ স্থান, সিদ্ধক্ষেত্র ও ব্রাহ্মণদিগের সমাজ এই কয় স্থানে ভোজন করিলে যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

উল্লিখিত তীর্থ ক্ষেত্রাদিতে জনসমাকীর্ণ স্থানেও আহার করা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্যত্র আহার করিতে হইলে বিজন অর্থাৎ পরিবেশকাদি অল্প জনাকীর্ণ স্থানে বসিয়া

আহার করাই নিয়ম। ভাবপ্রকাশ নামক চিকিৎসাগ্রন্থে ও বহু পুরাণে গোপনে আহার করিতেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করা হইল না। কুক্কুরাদি ও অন্ত্যজ জাতির দৃষ্টিদোষ নিবারণের জন্য আর্য্যগণ গোপনে আহার করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। প্রবাসগমনকালে পথিমধ্যে কখন কখন ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইত মাত্র।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম, কাব্যতীর্থ
ও পুরাণতীর্থ।

গৌরী।

ত্রিগুণাত্মিকা মহাশক্তি বঙ্গীয় শাক্ত কবিগণের দ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী বলিয়া প্রতিপন্ন। তাঁহারা জগৎসৃষ্টির আদিতে শক্তিরূপা মহামায়ার জন্ম, পতিনিন্দা শ্রবণে দক্ষযজ্ঞে তাঁহার তনুত্যাগ, পত্নীবিয়োগবিধুর মহাদেবের বৈরাগ্য, তদনন্তর হিমাদ্রিশিখরে মেনকা-গর্ভে এবং গিরিরাজের ঔরসে মহাশক্তির পুনরাবির্ভাব, তাঁহার বাল্যলীলা, এবং দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য পঞ্চতপাদি কঠোর তপস্যা, তদ্দ্বারা শিবসাক্ষাৎকার লাভ, উভয়ের বিবাহ, সংসারধর্ম্ম পালন, এবং ভক্তগণের সাধনানুযায়ী তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধি-বিধায়িনী বর্ণনা দ্বারা নরলোকে শাক্ত ধর্ম্মের প্রাধান্য সংস্থাপনে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পুরাণ-প্রথিত মূল উপাখ্যান যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনে অবশ্য সকলে পৃথক্ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কে কিরূপ ভাবে আপনাপন উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, গৌরীচরিতে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

প্রাচীন বলিয়া কবিগণের মধ্যে আমরা প্রধানতঃ চারিজন মহাকবি উপরি উক্ত বিষয়ে লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন দেখিতে পাই। ১। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ২। গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, ৩। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, এবং রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ইহাঁদের গ্রন্থের নাম যথাক্রমে চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, কালীকীর্ত্তন এবং শিবায়ন। পৌরাণিক গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে প্রাচীন পদ্ধতি ক্রমে জগতের উৎপত্তি সৃষ্টি প্রক্রিয়া, দেব যক্ষ রক্ষ নর কিন্নর পশু পক্ষ্যাদির উৎপত্তি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হয়, অন্ততঃ সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত উপরিউক্ত তিনটী কবিই প্রথানুসারে সৃষ্টি প্রক্রিয়া উপলক্ষে পরব্রহ্মের সহিত মহাশক্তির সঙ্গতি এবং তাহা হইতে পঞ্চতত্ত্বের উৎপত্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু

ও মহেশ্বরের উদ্ভব ইত্যাদি বিবর অন্যাতিরেকে বর্ণনা করিয়াছেন তৎপরে স্বায়ম্ভুব মনু। অঙ্গিরা, অত্রি প্রভৃতি ঋষি ও প্রজা সৃষ্টির পর দক্ষের সপ্তবিংশ কন্যার বিবাহ ও তদ্দ্বারা ক্রমশঃ প্রজা বৃদ্ধি। দক্ষ প্রজাপতিগণের অন্যতম, ব্রহ্মার মানস পুত্র, কিছু বেশি অভিমানী, তিনি ভৃগু মুনির যজ্ঞে কনিষ্ঠ জামাতা মহাদেবের নমস্কার না পাইয়া তাঁহার অপমান মাত্র উদ্দেশ্যে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞ সকল পুরাণেই দক্ষযজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ। এই যজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণবন্ধ হয়, তৎপত্নী দক্ষকন্যা উমা বিনাহ্বানে পিতৃযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া স্বামীর নিমন্ত্রণরোধের প্রতিবাদ করিলে দক্ষ যতদূর সম্ভব শিবনিন্দা করেন। পতিনিন্দা শ্রবণে যজ্ঞস্থলে সতীর তথায় তনুত্যাগ ঘটে। এরূপ পতিভক্তি জগতে অতুলনীয়, দক্ষকন্যা সতী সতীর আদর্শ। যিনি মহাশক্তির অবতার, যাঁহার ইচ্ছায় পরব্রহ্মের পরিস্ফুরণ এবং উপাধিলাভ, সতীধর্ম্ম তাঁহার আদরণীয়, পতিপ্রাণতা তাঁহারই ভূষণ। তাঁহার নিকট প্রাণাপেক্ষাও সতীধর্ম্মের সমাদর। সতীর দেহত্যাগ ঘটনা তিনটী পৃথক্ কবির পৃথক্ ভাষায় পাঠ করুন।—

শিবনিন্দা শুনি, মহা দুঃখ গুনি,
কহিতে লাগিলা সতী।
শিবনিন্দা কর, কি শকতি ধর,
কেন বাবা! হেন মতি॥
যারে কালে ধরে, সেই নিন্দে হরে,
কি কহিব তুমি বাপ।
তব অঙ্গজন্ম, তেজিব এ তনু,
তবে যাবে মোর পাপ॥

(অন্নদামঙ্গল)

গুরুজন-নিন্দা শুনি আচ্ছাদি শ্রবণ,
যেবা নিন্দা করে তার করিব শাসন।
সেই স্থান ছাড়ি কিবা যাই অন্য স্থান।
পাপ প্রতীকার হেতু তেজিব পরাণ॥
হৃদয়-সরোজে বাঁধি শিবের চরণ।
দৃঢ় করি ভগবতী পরিল বসন॥
যোগেতে ছাড়িলা তনু জগতের মাতা।
মুকুন্দ রচিল গীত গৌরীগুণ-গাথা॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

এতেক শুনিয়া সতী করে অনুতাপ।
হয়ে হায় হেন পাপী হৈল মোর বাপ॥
পাপ তনু হ'তে অনু জানি পাপ ভাগ।
যোগাসনে যোগিনী জীবন কৈল ত্যাগ॥

শিবায়ণ।

দক্ষালয়ে দেহ ত্যাগ করিয়া সতী জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্লা চতুর্থীতে তুহিনগিরিকন্যারূপে হিমাদ্রিশিখরে ভূমিষ্ঠা হয়েন। শাক্ত সম্প্রদায়ের এই সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা উপলক্ষে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, অমর সংস্কৃতকবি কালিদাস কৃত কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথমে দুইটী শ্লোকের আভাসে হিমালয়ের যে বর্ণনাটুকু করিয়াছেন, পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

উত্তরে করিয়া স্থিতি, আছেন নগাধিপতি,
হিমালয় দেবাত্মা প্রচণ্ড।
পয়োনিধি পূর্ব্বাপরে, বিভাগ করিল তারে।
যেন পৃথিবীর মানদণ্ড॥

সুমেরু থাকিতে উচ্চ, যাহারে করিয়া বৎস্য,
পৃথু করে পৃথিবী দোহন।
সর্ব্ব শৈল হয়ে জড়, ব্যাপার করিল বড়,
হৈল রত্ন মহৌষধিগণ॥
অনন্ত রত্নের প্রভু, কোন দোষ নাহি কভু,
সবে মাত্র হিমের আলয়।
এক দোষ গুণ রাশি, নাশে নাহি যেন শশী,
খণ্ডে ভাসে শোভা সমুচ্চয়॥

কবিকঙ্কণ এ পথে পদার্পণ করেন নাই—তিনিও বিশেষ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বভাবের সন্তান স্বভাবকবির অনুকরণে প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন, তিনি কেবল এতদুপ্রলক্ষে ;—

তুষারশিখর ভাগ্য নিবেদিব কি ?
ভুবনজননী হ'য়ে হৈলা যার ঝি॥
মৈনাক যাহার ভাই পরম সুন্দর।
কাটিতে নারিল যার পাখা পুরন্দর॥
পর্ব্বতরাজার ছিল যত কুলাচার।
ওদনপ্রাশন আদি করিল তাহার॥
করিল শ্রবণবেধ পঞ্চম বরষে।
মনোহর বেশ গৌরী দিবসে দিবসে॥
নিবিষ্ট করিয়া মন চণ্ডীর চরণে।
অম্বিকা-মঙ্গল কবি কঙ্কণেতে ভণে॥
কবিকঙ্কণ।

এই কয়েক পংক্তিতেই দেবীর বাল্যকালের কথা শেষ করিয়া গিয়াছেন, রামেশ্বরও তদনুরূপেই সারিয়াছেন বলিতে হইবে,—

দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন শশধর।
শোভা করে কলান্তের যেন জ্যোৎস্নান্তর॥

পর্ব্বত পুণ্যাহ পেয়ে পাঁচ মাস কালে।
কর্ণবেধ কন্যার করিল কুতূহলে॥
পুণ্যায় পরমানন্দে পরিপাটী করি।
সাত মাসে শিশুকে ওদন দিলা গিরি॥
গৌরী নাম রাখিল গিরীন্দ্র গুণবান্।
গুণ কর্ম্মভেদে হইল অনন্ত আখ্যান॥
শিবায়ণ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার পর গৌরীর হীরা-মণি-মাণিক্যাদি বহুমূল্য রত্ন প্রভৃতি বহুল অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন, সে গুলি যে অঙ্গে যেমন সাজিয়াছে সেই অঙ্গের তেমনি শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, কিন্তু কবিকঙ্কণ বিনালঙ্কারে তাঁহার ভুবন-মোহন রূপের বর্ণনায় যে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।

হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডিকা।
আনবেশ দিনে দিনে, শোভা অলঙ্কার বিনে,
দেখি সুখী হইল মেনকা॥
উরুযুগ করিকর, নাভি সুগভীর সর,
দুই ভুজ মৃণাল সঙ্কাশ।
বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কার শোভা,
অন্ধকার করয়ে বিনাশ॥
অধর বন্ধুকবন্ধু, বদন শারদ ইন্দু,
কুরঙ্গগঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দুর ফোঁটা
তনুরুচি ভুবনমোহন॥
নাসাতে দোলয়ে মতি, হীরায় জড়িত তথি,
বদনকমলে ভাল সাজে।
তুলনা সে দিতে নারি, তাহে অতি মনোহরী
তারা যেন সুধাকর মাঝে॥

* বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ।

গৌরীর বদনশোভা, লখিতে না পারি কিবা,
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
মলিন চাঁদ সেই শোকে, না বিচারি সর্ব্বলোকে,
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা॥
গৌরীর দশনরুচি, দেখিয়া দাড়িম্ববীচি,
মলিন হইল লজ্জাভারে।
অনুমান করি মনে, ওই শোকের কারণে,
পক্ককালে দাড়িম্ব বিদরে॥
শ্রবণ উপর দেশে, হেম মুকুলিকা ভাসে,
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কেশপাশে।
আবাঢ়িয়া মেঘ মাঝে, যেমন বিজুলী সাজে,
পরিহরি চপলতা দোষে॥
স্থূলতা উদরে ছিল, বলে তা লুঠিয়া নিল,
উরস্থল জঘন দুজনে।
চরণ চঞ্চল ভাব, লোচন করিল লাভ,
নব নৃপ আসিতে যৌবনে॥
দেখিয়া গৌরীর রূপ, চিন্তিত পর্ব্বতভূপ,
কারে দিব এই কন্যা দান।
উমাপদে হিত চিত, রচিল নৌতুন গীত,
শ্রীকবিকঙ্কন রসগান।

এই রূপ-বর্ণনায় সংস্কৃতকবির ছায়া কবিকঙ্কণ কোন কোন স্থলে দেখিতে পাইলেও যেন তাহাতে নূতন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে। মুকুন্দরাম ও রামেশ্বর এতদুভয়ে সুকবিত্বসাধক বলিয়া ইহাদের বিশেষ প্রসিদ্ধি নাই, কিন্তু রামপ্রসাদ সেন সাধনায় সিদ্ধ এবং কবিত্বশক্তি সম্পন্ন। তিনি আপনার ইষ্ট দেবতাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন, এবং মাতৃভাবেই পূজা ও উপাসনাদি করিতেন। "মা" বলিতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিত, চক্ষু ফাটিয়া মন্দাকিনীর পূতধারার ন্যায় পুলকাশ্রু নিঃসৃত হইত, তিনি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেন। তাঁহাকে জগন্ময়ী দেখিতেন, পুত্রের প্রতি মাতার যে বাৎসল্যভাব তাহা অনুভব করিয়া ধন্য হইতেন, সুতরাং দেবীর বাল্যলীলা বর্ণনায় মেনকার বাৎসল্যভাব স্বতই পরিস্ফুরিত হইতে পারিয়াছিল। কবিরঞ্জন দেবীর বাল্যলীলা যেরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বড়ই স্বাভাবিক, যার পর নাই চিত্তস্পর্শী। বালস্বভাবা গৌরী নিশাশেষে সুধাকরদর্শনে জননীকে তাহা ধরিয়া দিবার জন্য সাধারণ বালিকার ন্যায় আবদার করিলে মেনকা তাঁহাকে কিছুতেই তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে অসমর্থা হইয়া স্বামীকে বলিতেছেন,—

গিরিবর!
আর আমি পারিনে হে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে॥
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধ'রে দে উহারে।
আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে॥
কাঁদিয়ে ফুলায় আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে।
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলী,
যেতে চায় না জানি কোথারে॥

গিরিরাজরাণী কন্যার আবদার রক্ষা করিতে না পারিয়া বড়ই বিব্রতা ও ব্যতিব্যস্তা হইয়া উঠিলেন এবং অসান্ত্বনীয়া কন্যাকে স্বামীহস্তে অর্পণ করিলে, তিনি পুরুষবুদ্ধির কৌশল বিস্তার করিলেন, তিনি গৌরীকে কোলে লইয়া "এই চাঁদ লও" বলিয়া, তাঁহার হাতে এক খানি আরসী দিলেন। গিরিরাজকন্যা দর্পণে আপনার বদনবিধু দর্শন করিয়া পরম পুলকিত এবং অচিরে সুনিদ্রিতা হইলেন;

উঠে বোসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীকে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে দেখিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটী শশধরে॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগৎ জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥
কালীকীর্ত্তন।

দুর্ভিক্ষচিত্র।

৩ নং।

(শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, বরিশাল।)

১

আমি যে তোদের মাগো! আপন সন্তান,
নাই কোন সাজ সজ্জা, তাতে মা, কিসের লজ্জা।
ছেলের নিকটে মার সকলি সমান।
বসিতে আসন দিতে পারিলেনা, তা'তে চিতে,
কিসের বিষাদ মাগো! কোন্ অপমান?
বসন বিহনে হায়! কলাপাতে ঢাকা কায়*
এই মা বসন লও, কর পরিধান।
অনাহারে জরাজীর্ণ, অবসন্ন ক্লান্ত শীর্ণ,
ওমূর্ত্তি দেখিয়া মাগো! ফেটে যায় প্রাণ।
কি জানি কাহার পাপে, কোন্ ব্রহ্ম অভিশাপে
সোণার এ বরিশাল হয়েছে শ্মশান,
ঘরে ঘরে হাহাকার, ঘরে ঘরে অনাহার
ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষের বদন ব্যাদান।
সোণার এ বরিশাল হ'য়েছে শ্মশান।

২

আমি ত মা পর নই, আপনার জন,
দুয়ারে দুয়ারে মাগি, এনেছি তোমার লাগি
সামান্য তণ্ডুল এই, কর মা রন্ধন।

* বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, ১৩১৩ সালের প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের দিনে বরিশালের বহুতর মুসলমান কুলললনা, বস্ত্রাভাবে কদলীপত্রে লজ্জানিবারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত তাহাদের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করেন।

ছেলেদের নিয়ে দু'টী, নিজে খাও এক মুষ্ঠি
থাক্ মা, কাঁদিতে নাই,—সম্বর রোদন!
কে জানে কাহার পাপে, কোন্ ব্রহ্ম-অভি-
শাপে
সোণার এ বরিশাল হ'য়েছে এমন!
যার অন্নে দেশ বাঁচে, সেই আজ অন্ন যাচে!
অন্নহীনা অন্নপূর্ণা মলিন বদন!
অধম অভাগা জাতি, নিত্য খায় জুতা লাথি,
তথাপি তাদের আজো হ'লনা চেতন!
দেশের কৃষককুল, হ'য়ে গেল বিনির্ম্মূল,
একটু করুণা নাই তাদের কারণ!
হায়! আজ ঘরে ঘরে, না খেয়ে মানুষ মরে,
কার কাছে এ বেদনা করি নিবেদন?
থাকিলে সহস্রপ্রাণ, করিতাম বলিদান
এ জাতীয়-প্রায়শ্চিত্ত করিতে সাধন।
অন্নহীনা অন্নপূর্ণা মলিন বদন!

৩

দেখিয়া দেশের দশা, বুক কে'টে যায়,
এস ভাই বঙ্গবাসি, একবার দেখ আসি
সোণার এ বরিশাল শ্মশান-শয্যায়!
ক্ষুদ্র কি মহৎ উচ্চ, হও দীন, হও তুচ্ছ,
যার যা সামর্থ থাকে, যা থাকে উপায়,
দেও তাই দয়া করে, দীন কাঙ্গালের তরে,
বাঁচাও কৃষকগণে; ভিক্ষা মাগি পায়!
পুত্র কন্যা যার আছে, এই ভিক্ষা তার কাছে
উপবাসে কত শিশু দেখ মারা যায়!
যার আছে মা ভগিনী, আসিয়া দেখুন তিনি
রমণী রাখিছে লজ্জা কলার পাতায়!
এদুর্গতি এ নিয়তি, হায়! হায়! বিশ্বপতি
কোন্ পাপে এদেশের কে করে আমায়,
যদি এ জীবন দিলে, দেশের মঙ্গল মিলে,
তার চে'য় কি আনন্দ আছে এ ধরায়?
হে বিভো!, সবার পাপ, সমুদায় অভিশাপ,
আমার জীবন নিয়া ক্ষমহ সবায়!
কি আর কহিব আমি, তুমি নাথ অন্তর্য্যামী
প্রাণের সকল কথা ফুটেনা ভাষায়।
যে বাসনা এ অন্তরে পূরাও তা দয়া করে,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ, ক্ষতি নাই তা'য়।
হেরিয়া দেশের দশা বুক ফেটে যায়।

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ।

বিধবাবিবাহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"এই মূল সূত্র (অথাতোঽধিকারঃ) সংক্ষিপ্ত হইলেও অসন্দিগ্ধ স্বল্পাক্ষরনিবদ্ধ উপদেশের আধার। *"

ভারতভূমির সেই প্রথিতযশা, স্বার্থ-পরিশূন্য সর্ব্বজনহিতৈষী শাস্ত্রকারগণ বিধবা রমণীর প্রতি তিন প্রকার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম সহমরণ বা অনুমরণ; দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য্য; তৃতীয় পুনর্ব্বিবাহ। আমরা যথাসাধ্য ক্রমশঃ এই তিন প্রকার কর্ত্তব্য বিবৃত করিতেছি।

১। সহমরণ বা অনুমরণ—মৃত পতির সহিত চিতানলে পুড়িয়া মরাকে "সহমরণ"

* বঙ্গদর্শন—১৩১১ সাল অগ্রহায়ণ। "ব্রাহ্মণ" শীর্ষক প্রবন্ধ।

করে। আর প্রবাসী পতির মৃত্যুর পরে তাঁহার পাদুকা প্রভৃতি বক্ষে লইয়া চিতারোহণ-করাকে "অনুমরণ" বলা হয়। হিন্দুশাস্ত্রে আত্মহত্যা মহাপাতক রূপে পরিগণিত হইলেও সহমরণ ও অনুমরণকে আত্মহত্যারূপে গণনা করা হয় নাই। এইখানে সেই "অথাতোঽধিকারঃ" স্মরণ করিতে হইবে। বিধবার সেই শোকের তীব্রতা, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অসমর্থতা, এবং বাকী জীবনের পরিপূর্ণ ব্যর্থতা নিরাকরণ আশয়ে ঋষিগণ এই সহমরণ বা অনুমরণ বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে "মানব শরীরে যত কোটি রোম আছে, সহমৃতা বা অনুমৃতা সতী তত কোটি বৎসর স্বামীর সহিত স্বর্গবাস করিতে পারিবেন।" পতিশোকাকুলা সদ্যবিধবার পক্ষে এই প্রলোভন অসম্বরণীয় বলিয়াই হউক, আর পরিণামে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশের বিভীষিকা মনশ্চক্ষে দেখিয়াই হউক, অনেক রমণীই সহমৃতা বা অনুমৃতা হইতেন। কিন্তু একবিধ কার্য্যে সর্ব্বত্র সুফল হয় না। যাঁহারা প্রকৃত প্রেমময়ী ভার্য্যা, যাঁহারা পতির মৃত্যুতে আপনাকে মৃতা বলিয়া মনে করেন, তাদৃশী পতিপ্রাণা রমণীর পক্ষে সহমরণ বা অনুমরণ এক আনন্দময়ী শান্তিময়ী ঘটনা। ঐরূপ অনেক সতী জলন্ত চিতায় হাসিতে হাসিতে জীবন সমর্পণ করিয়া সাধারণের বিস্ময় ও ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন। কিন্তু সকল বিষয়ে সকলের অধিকার নাই, সেই জন্য এমনও ঘটিয়াছে যে, কত সাধ্বী প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপ, রক্ত মাংসময় দেহে সহ্য করিতে না পারিয়া চিতা হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়াছেন; তখন অখ্যাতিভয়ে—অসতী অপবাদভয়ে তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুগণ বংশ দণ্ডাদি আঘাতে তাঁহাদের জীবন শেষ করিয়া স্বর্গবাসের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সেই সকল সতীর ভাগ্যে পরলোকে যতই সুখ স্বচ্ছন্দতা ঘটুক না কেন, ইহলোকে এতাদৃশ সহমরণ বা অনুমরণকে অতি ভয়ানক, অতি নৃশংস ব্যাপার বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। এই জন্য সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা ভারতবর্ষে বহু দিনই হইতেছিল। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনীর এক স্থলে লিখিয়াছেন, "হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বেই আদেশ প্রচার করিয়া ছিলাম যে, সন্তানবতী জননীগণ স্বামীর সহগমন করিতে ইচ্ছুক হইলেও এই প্রকারে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারিবে না। এক্ষণে আমি পুনরায় আদেশ দিলাম যে, কোন স্ত্রীলোককেই বল প্রয়োগ করিয়া স্বামীর সহিত এক চিতায় জীবন্ত দাহ করিতে পারিবে না। অপর দিকে ইহাও আদেশ দিলাম যে, হিন্দুগণের কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান কিংবা অপর কোন কার্য্য কেহ বল প্রয়োগ করিয়া ধ্বংস করিতে কিংবা বাধা দিতে পারিবে না।" এই সকল চেষ্টা ও ইচ্ছার বহুকাল পরে রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ সহৃদয় মহাত্মাদিগের অদম্য অধ্যবসায় ও একান্ত চেষ্টার ফলে সতীদাহ নিবারণ ব্যাপার লর্ড উইলিয়ম

বেণ্টিঙ্ক মহোদয় কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এখন রমণীর ইচ্ছাই থাকুক আর শাস্ত্রেই ব্যবস্থা থাকুক, সহমরণ বা অনুমরণ রাজদণ্ডভয়ে এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং আমরাও এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিতে ক্ষান্ত হইলাম।

২। ব্রহ্মচর্য্য—তখন আইনের নিষেধ না থাকিলেও সহমরণ বা অনুমরণ যে সকলের সাধ্য নহে, একথা পরম জ্ঞানী ঋষিগন জানিতেন। সেই জন্য অধিকার বিচারপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জনে অশক্তা বিধবাদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত করেন। মৃত স্বামীকে স্মরণ করত পত্নী নিয়মস্থা হইয়া মৎস্য মাংস প্রভৃতি রজোগুণের উত্তেজক খাদ্য, অলঙ্কারাদি সর্ব্ববিধ বেশ ভূষা পরিত্যাগ, হবিষ্যান্ন, একাহার ও সত্ত্বগুণের উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ, চীর পরিধান পূর্ব্বক ধর্ম্ম কর্ম্মে দিনাতিপাত, এবং সর্ব্ব বিষয়ে আত্মসংযম, এই ব্রতাচরণকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা হয়। সহমরণে অক্ষমা বলিয়া ব্রহ্মচারিণীদিগের প্রতি ঋষিগণ বিন্দুমাত্রও অবজ্ঞা করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে কতদূর গৌরবের চক্ষে দেখিতেন, নিম্নলিখিত একটী মাত্র শ্লোক হইতে আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি,

ভগবান্ মনু বলেন—

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী-স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

সদাচারশালিনী স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিবেন। তিনি অপুত্রা হইলেও (অপুত্রক বালখিল্যাদি) ব্রহ্মচারিগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করিবেন।

আজ যদিও আমরা "বিধবাবিবাহ" আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত, তথাপি ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে দুই চারিটী কথা না বলিয়া বিষয়ান্তরে মনঃ সংযোগ করিতে পারিতেছি না, সহৃদয় ব্যক্তিগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

আর্য্য ঋষিগণের উপদেশানুসারে ব্রহ্মচর্য্যের অধিকারিণী বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যাঁহারা স্বামীর প্রতি গভীর প্রেমপরায়ণা, যাঁহারা প্রাপ্তবয়সে মৃতপতিকা, যাঁহারা সন্তানের জননী, যাঁহারা পতিকুলের গৌরব, সম্ভ্রম ও সম্পত্তি রক্ষার্থে আত্মত্যাগিনী, এই সকল বিধবারই ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার আছে।

যাঁহারা ব্রহ্মচারিণী অথবা ব্রহ্মচর্য্য করিবার জন্য যোগ্যা, যথানিয়মে তাঁহাদিগের ঐ পবিত্র ব্রতে সহায়তা করা অভিভাবক ও আত্মীয়দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা জানি, অনেক স্থলে বিধবা তরুণীদিগকে ব্রহ্মচর্য্যে নিযুক্ত করা হয় না। যাহারা তরুণবয়স্কা, যাহাদের মাতা পিতা প্রভৃতি বর্ত্তমান, যাহাদের সমবয়স্কা যাতা, ভগিনী প্রভৃতি ভোগবিলাসে আসক্তা, অনেক সময়ে তাহাদের আহার পরিচ্ছদের সংযম করা হয় না। স্নেহের অনুরোধে বিধবা তরুণী কেশবিন্যাসও করে, ভাল শাড়ীও পরিধান করে, সুন্দর জ্যাকেট বডীও গায়ে দেয়, স্বর্ণালঙ্কারেও দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি করে, স্থানে স্থানে আমিষ আহারও

দেওয়া হইয়া থাকে। উপরোধ অনুরোধে বা চক্ষুলজ্জার দায়ে সমাজ এ সকল বিষয়ে উদাসীন থাকেন। আমাদের কথা এই যে, যাহাদিগকে চিরদিন বৈধব্যাবস্থায় থাকিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য্যই যাহাদিগের পালনীয় ব্রত, স্নেহমমতা বশে, মার্জ্জিত-রুচির অনুরোধে অথবা অন্যান্য কারণে তাহাদিগের ভোগলালসা পরিবর্দ্ধন করা, তাহাদিগের সংযমশক্তিকে হ্রাস করা যে নিতান্ত অপরিণামদর্শিতার কার্য্য, একথা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন যে, ব্রহ্মচর্য্যের কার্য্য সংযমশক্তির অনুশীলন—আত্মত্যাগ; ফল চিত্তশুদ্ধি। ইহা প্রাচ্য জাতির মনুষ্যত্ব শিক্ষার প্রধান উপকরণ। বিধবাদিগের আহারপরিচ্ছদাদির সংযতি এবং ত্যাগস্বীকার যে, তাঁহাদিগের অবলম্বিত নিবৃত্তিপথকে অপেক্ষাকৃত সুগম করিয়া দেয়, একথা অনুধাবন করিলে সকলেরই উপলব্ধি হইতে পারে। *

(ক্রমশঃ)

* আহার পরিচ্ছদাদির সংযমে মানবচিত্তে কতদূর বৈরাগ্যভাবোদয় হইতে পারে, নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পুরাণে আছে, মহর্ষি অগস্ত্য পিতৃলোকদিগের আদেশক্রমে রাজকন্যা লোপামুদ্রাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরে স্বামীর ইচ্ছাক্রমে হউক অথবা সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য পালনার্থে হউক, লোপামুদ্রা গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি বিলাসিতার সমস্ত উপকরণগুলি যাচকদিগকে বিতরণ করিয়া, বল্কলধারিণী, ফলমূল হারিণী হইয়া তপস্যায় নিরতা থাকেন। বহু বৎসর এইরূপে অতীত হইলে একদিন মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে জিজ্ঞাসা করেন, "ভদ্রে! আমি পিতৃলোকদিগের আদেশে পুত্রার্থে তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এত দিনেও তুমি পুত্র বর প্রার্থনা করিলে না, ইহার কারণ কি?" তখন লোপামুদ্রা কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিলেন, "প্রভো! আমি সর্ব্ববিধ ভোগবাসনা সংযত করিয়া আপনার সহিত তপস্যা করিতেছি, ইহাতে আমার যে চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়াছে, সেই ফলে পুত্রবিত্ত প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর সুখকামনা আর আমার চিত্তে স্থান পাইতেছে না। কিন্তু আপনি যখন ধর্ম্মার্থে পুত্রকামনার আদেশ করিতেছেন, তখন আমাকে এই কুশবলয়, রুদ্রাক্ষমালা, বল্কলবস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে রত্নালঙ্কার, উত্তম বস্ত্র, সুস্বাদু আহার পানীয় এবং কৌমার কালের ন্যায় ধনসম্পদ্ দাসদাসী পরিবৃত গৃহ প্রদান করুন।" কথিত আছে, মহর্ষি অগস্ত্য ভার্য্যার পরামর্শে, তপোবলে লোপামুদ্রাকে তাঁহার প্রার্থিত পদার্থ সকল দান করেন এবং অচিরকালমধ্যে লোপামুদ্রা উত্তম পুত্র প্রসব করিয়া পতির পিতৃঋণ হইতে মুক্তির সহায় হন।

প্রঃ লে।

বৎসরান্তে।

আজি সেই ৪ঠা আষাঢ়, যে দিন বামাহিতৈষী মহাত্মা ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত স্বর্গারোহণপর্ব্ব দিন। এই বিদায়ের দিন আমাদের চিরস্মরণীয়। আমরা সকল ভগ্নী সম্মিলিত হইয়া তদীয় আত্মার মঙ্গলার্থে ব্রহ্মপদে আরাধনা করিব। এ পূজায়

আমাদের পত্র-পুষ্প-ফল জল কিছুরই প্রয়োজন হইবেনা। এ কেবল স্মৃতির পূজা, আর অশ্রুজল ইহার উপহার। নারীজীবনের বিশুদ্ধ ভক্তিরসাভিসিক্ত পূত প্রার্থনা যেন পুষ্পসৌরভের সহিত, পবনহিল্লোলের সহিত ও দিবাকরের নব কিরণের সহিত মিলিত হইয়া সেই একাদিদেব মহাদেবের চরণে পতিত হয় এবং তদীয় নির্ম্মল আত্মা উজ্জ্বলতর হইতে উজ্জ্বলতম পুণ্য প্রতিভায় পূর্ণ হয়। তিনি যে, সকল সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার পুরস্কারেই সেই বিশুদ্ধ আত্মা অলঙ্কৃত হইয়াছে, ইহা তাঁহার আত্মীয়স্বজন, পুত্রকন্যা ও বন্ধুবান্ধবের পরম শান্তির আশ্রয়। আমাদের প্রিয়জন পরম সুখে আছেন, তিনি সকল দুঃখ অভাব হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইহা শোকসন্তপ্ত ও প্রিয়বিচ্ছেদকাতর প্রাণের সান্ত্বনাদায়ক বটে। কিন্তু মানবহৃদয় এমনি স্বার্থপূর্ণ যে, সুখের সহিত সুখ ও দুঃখের সহিত দুঃখকে মিলিত করিতে না পারিলে আমাদের সার্থকতা হয় না। তাই যেন শূন্যতায় সর্ব্বশূন্যতা বোধ করি। যতক্ষণ না আত্মায় পরমাত্মায় সম্মিলন হয়, যতক্ষণ সেই পরম সত্বার ছায়া এই অপূর্ণ হৃদয়ে প্রতিফলিত না হইবে, ততদিন আমাদের ক্রন্দন ঘুচিবে না। তাই আজি কাঁদিতে কাঁদিতে পরমপিতাকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, পরলোকগত আত্মার আশীর্ব্বাদ ইহলোকে বর্ষিত হইয়া, হৃদয়ের মলাধুলা ধৌত করুক। আমরা যেন স্বর্গীয় আত্মার প্রতি চিরদিন সমভাবে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া কর্ত্তব্যসাধন করিতে পারি। সেই অবিনশ্বর আত্মা আমাদের চক্ষের সম্মুখে চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় নিশিদিন করুণার কিরণ বিকিরণ করুন, আমরা সেই আলোক ধরিয়া সত্য পথে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। আজ স্বর্গমর্ত্ত্যের যে ব্যবধান, যে দূরত্ব অনুভব করিয়া আমাদের প্রাণে হাহাকার ঘটাইতেছে, তাহা নিকট ও এক হইয়া চির আরাম প্রদান করুক। আমরা ভগবানের করুণা ধরিয়া সেই অমৃতময়ধামে প্রবেশের যোগ্য হইতে পারি। এই সংসার যেমন সুখের উপাদানে গঠিত, তেমনি পদে পদে ক্ষণভঙ্গুর ও নশ্বরতায় মণ্ডিত। আমরা আজ যে বস্তটী অতি মনোরম বলিয়া গ্রহণ করিলাম, কালই তাহা মলিন হইয়া লুপ্ত হইবে, কেবল একবার মাত্র সৃষ্টিকর্ত্তার সৌন্দর্য্য ও শিল্পকুশলতা প্রকাশের জন্য অবনীতে বিকাশ হয়, সেই রূপ গুণ যে ভগবানের অংশ আমরা তাহা বুঝিনা, আমরা ভাবি ইহা বুঝি আমাদের নিজের একচেটে বস্ত, ইহা হইতে কখনই বিচ্যুত হইতে হইবেনা, সেই আশা, সেই ভরসা বক্ষে পোষণ করিয়া বঞ্চিত হই, কিন্তু আসল মূলসত্তাকে ভুলিয়া যাই। ইহা কি আমাদের অন্ধতা? না তাহা নহে। আমরা যে অতি ক্ষুদ্র, অতি অকিঞ্চন, সুতরাং আমরা সেই বিশ্বরূপের মহাপ্রেমের মূর্ত্তির কল্পনাও হৃদয়ে ধরিতে পারি না। ক্ষুদ্র

হইতে ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম ছটা টুকু দেখিয়া বিহ্বল হই। ইচ্ছা হয় উহাতেই বিলীন হইয়া থাকি। ঈশ্বর সেই মোহ ভাঙ্গিবার জন্য,পরীক্ষায় ফেলেন, তখন আমরা আকুল প্রাণে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। তবু দেখা পাই না। অবশেষে অবোধ শিশুর মত কাঁদিতে থাকি। এই ক্রন্দন মানবজীবনের ধর্ম্ম। জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত কেবল ক্রন্দন, তাই আজ এই মহাপূজায় অশ্রুজলের কল্লোল চারিদিকেই বহিতেছে। সেই ধর্ম্ম-বীর স্বর্গ-সিংহাসন হইতে দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, আর মঙ্গলসত্ত্বার ভাবে পূর্ণ করিতেছেন। আজিকার মত বর্ষে বর্ষে যেন সেই মহাত্মার স্মরণার্থ আমরা ভগবানের সম্মুখে আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ মস্তক অবনত করিতে পারি। সেই সাধুজীবনের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম যেন আমাদের চক্ষের সম্মুখে আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকে। আজি তাঁহার শোকার্ত্ত পুত্রকন্যাদিগের সহিত প্রাণের সমবেদনা এক করিয়া এই পবিত্র বাৎসরিকে প্রবাস হইতে বিশ্বপিতার চরণে প্রণাম করিতেছি ও সেই সত্য-সেবকের আত্মার কল্যাণ উদ্দেশে সাংসারিক পুণ্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়া ধন্য হইবার কামনা করিতেছি।

হে পরমেশ্বর! পরলোকে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা তোমার দাস। আর ইহলোকে আমরা তোমার দাসানুদাস; অতএব আমাদের প্রতি চাহিয়া দেখ! আমরা শোকতাপে জর্জ্জরিত ও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া জীবনে মৃতবৎ হইয়া আছি। হে পরম দয়ালু অনাথনাথ! তুমি সর্ব্বসন্তাপহারী। কখন পিতারূপে কখন পুত্ররূপে আমাদের মমতা দেখাইতেছ, নিত্য নব নব প্রেমসূত্রে বদ্ধ করিয়া এমন শৃঙ্খলে জড়াইয়াছ যে, আজ হরিণীর ন্যায় সেই জালে বদ্ধ হইয়া তোমার মুখপানে চাহিয়া আছি, কিন্তু কিছুই দেখিতেছি না। নয়ন, সলিলে মগ্ন হইয়া আছে। জ্ঞান মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। শুধু হতাশা সার। তুমিই একমাত্র অন্ধকারের আলো। আইস! প্রকাশ হও! যে যে প্রাণে দুঃখের আগুন জ্বলিয়াছে, তথায় শান্তি দান কর। কিন্তু স্মৃতিটুক মুছিও না। বামাকুলকল্যাণাকাঙ্ক্ষী সাধু ৺উমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি জাগরিত করিবার নিমিত্ত "বামাবোধিনী" অনাথিনীর বেশে এখনও ঘরে ঘরে ভগিনীগণকে ডাকিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা সাদরে তাহাকে গ্রহণ কর, তাহার জীবনরক্ষার উপায় কর। বহুকাল হইতে তাহার মূল মন্ত্র, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ," সেই মন্ত্র জাগাও। সকলে মিলিয়া এক দেবতার চরণে এক প্রাণে সিদ্ধির প্রার্থনা কর। যাঁহারা ভক্ত ও শিষ্য, তাঁহারা কায়মনচিত্তে যেমন দেবতার পূজা করেন, তদ্রূপ তদীয় কার্য্যের প্রতি আস্থা প্রদান করুন। কর্ম্মই আমাদের ইহ ও পরজীবনের একমাত্র মুক্তির পথ। অদ্য যে সাধুর আত্মার উদ্দেশে সকলে সমবেত হইয়া ভগবানের করুণা কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই সাধুর কর্ম্মের অনুকরণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করাই আমাদের

ভক্তির পরিচয়। সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতার চরণে আমাদের নিবেদন, সেই সাধুর কীর্ত্তি ইহলোক ও পরলোকের পুণ্যকর্ম্মের ন্যায় অক্ষুণ্ণ থাকুক্। আজ এক বৎসর তাঁহার প্রিয় বামাবোধিনীতে আমরা তদীয় কল্যাণময়ী উপদেশ শুনিতে পাই নাই, তাঁহার মঙ্গলময় অভিপ্রায়ে শিক্ষিত হই নাই, ইহা বামাগণের পক্ষে পরম ক্ষতিজনক ও অভাবের কারণ, এ কথা ভাবিলেই শোকে মগ্ন হইতে হয়। কিন্তু স্বার্থবন্ধন যদি খুলিয়া দেখি, তবেই জানা যায় যে, এই ক্ষুদ্র কার্য্য হইতে, ক্ষুদ্র সুখ হইতে অবসর লইয়া তিনি মহাব্রতে ব্রতী হইয়া এক্ষণে অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার যে কার্য্যগুলি আমাদের ক্ষীণশক্তি দ্বারায় চালিতে হইতে পারে, সাধ্যপক্ষে তাহার অবহেলা করা উচিত নহে। একদিন এক সময়ে সকলে একবার তাঁহার সৎকীর্ত্তির স্মরণ করিয়া, তদীয় অভাবে অনুতপ্ত হইয়া ইতি কর্ত্তব্য করিলে সার্থকতা হয় না। সেই পরোপকারী মহাত্মার কার্য্যকলাপ পন্থা প্রতিদিনের স্মরণীয়।

হে ভগবান্! আমাদের অবলাকুলের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, আমাদের হৃদয়ে সৎকার্য্যের জন্য বল দাও। বামাহিতৈষী মহাত্মা ৺ উমেশচন্দ্র দত্তের বাৎসরিকে আমাদের এইপ্রার্থনা।

ওঁ হরি শান্তি

শোকাহতা বিনীতা

ভগ্নী।

স্মৃতি-পূজা।*

মরণীর শোক তাপ ফেলিয়া ধরায়,
শান্ত সমাহিত যোগী আছ অমরায় ;
ভাষায় কি ফুটে কথা ! তোমা হারাইয়া,
যে ভাবে অবশ প্রাণে চলেছি ভাসিয়া।
মোরা সবে ও চরণে দিয়েছি অঞ্জলি,
এখনো এ শিরে নিত্য মাখি পদধূলি,।
আমা হেন বালুকণা যতনে লইয়া,
চাহিয়াছ নিশিদিন গঠিতে এ হিয়া।
ভক্তি প্রেম ক্ষমা গুণ শিখাতে পামরে,
মহা ঋষি এসেছিলে এ পান্থ-আগারে।
জ্ঞানধর্ম্ম পিয়াসা ত তুমি জাগায়েছ,
অকাতরে সুধাধারা সদা ঢালিয়াছ,
আজো সে অদম্য তৃষা জ্বলে দিবারাত,
সংসার শ্মশানভূমি কাঁদি অবিরত।
মহাযোগী রাখ মোরে সংসারে অটল,
কর্ম্মযোগী দাও কিছু সাধনার বল।
নির্ব্বাপিত সব শক্তি বিশ্বাসবিহীন,
বজ্রাহত জীব আমি অতীব মলিন।
জীবনের ধ্রুবতারা গিয়াছে ডুবিয়া,
এ মহাশ্মশানে কাঁদি আত্ম হারাইয়া।

(* ৺ দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে।

এতকাল যত শিক্ষা দিয়ে ক্ষীণ প্রাণে।
ভুলিয়াছি সব হায়! কি ফল জীবনে?
আজি—
ঊর্দ্ধলোক হ'তে আলো ঢাল এ পরাণে,
জাগুক এ মৃত প্রাণ বিশ্বাসের গুণে।

গৃহচিকিৎসা-পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। সপিশমের বীচি (হাকিমী মসলার দোকানে পাওয়া যায়) চূর্ণ করিয়া ।০ আনা পরিমাণ দুগ্ধ বা গরম জলসহ প্রতিদিন সকালে সেবন করিলে বাত রক্ত, কুষ্ঠ ও পারদবিকার নিবারণ হয়। ঔষধ সেবন কালীন ঘৃতপক্ব ব্যঞ্জন ও দুগ্ধ আহার করিতে হইবে।

২। শ্বেতকুষ্ঠে—গরুর হাড় (যাহা অনেক দিবস মাটীর নীচে আছে) চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে ধবল রোগ দূর হয়।

৩। ক্ষত মাত্রে ঘৃত ৮ তোলা, নিমপাতা ১ তোলা, ছোট পেঁজ ১ তোলা, কেঁচুয়া ১ তোলা। প্রথমতঃ ঘৃত অগ্নিতে জাল দিবে। ফেনা মরিলে নিমপাতা প্রভৃতি এক একটী দ্রব্য পুড়িয়া যাওয়া পর্য্যন্ত ঐ ঘৃত পৃথক্ পৃথক্ ভাজিবে। পরে ঐ ঘৃত ছাঁকিয়া নেকড়ায় মাখাইয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া রাখিলে ক্ষত শুকাইবে।

৪। কুষ্ঠ রোগ—শরীরে অর্দ্ধচাকার ডুম ডুম মাংস ফুলিয়া উঠিলে আপাঙ গাছের সমস্তাংশ তামাকের মত কুচিত করিয়া নূতন হুঁকা ও কলিকাতে সাজিয়া (দিবসে ৪।৫ বার) ধূমপান করিলে নিশ্চয় কমিয়া যাইবে। কখন কখন মূল রোগও নির্ম্মূল হইয়া থাকে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ৺ নলিনীবালা নাগ। শ্রীমতী নলিনীবালা নাগের স্বর্গারোহণ দৃশ্য। এখানি ক্ষুদ্র পদ্যগ্রন্থ। ৺ নলিনীবালা ৺ প্রাতঃস্মরণীয় আনন্দমোহন বসু মহোদয়ের কন্যা। তিনি আর ইহলোকে নাই। তিনি বিদায়কালে যেন, শোকাতুরা জননীকে সান্ত্বনা দিয়া যাইতেছেন, এই ভাবে কাব্যখানি রচিত। কাব্যখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, অলৌকিক মহত্ত্বপূর্ণ দিব্যভাবে পূর্ণ। লেখিকা গৃহপালিত পশুপক্ষী ও উদ্যানের তরুলতাদি সমস্ত পদার্থে যে অকৃত্রিম সদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ৺ স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহনের পরিবারের উপযুক্ত।

২। সতী লক্ষ্মী—শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস, মূল্য ॥৵ আনা মাত্র।

বিধু বাবু সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। যথার্থ সতী-লক্ষ্মীর আবির্ভাবে ঘোর দুঃখ দারিদ্র্য ও বিপদের মধ্যেও সংসারে যে সুখ ও শান্তির আবির্ভাব হয়, তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র উপন্যাসে অতি সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। ইহা স্ত্রী পুরুষ সকলেরই পাঠোপযোগী এবং প্রত্যেকেরই শিক্ষাপ্রদ। এইরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বহুল প্রচার ও সাধারণের সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়।

নূতন সংবাদ।

১। সম্প্রতি শ্রীরামপুরে এক পুষ্করিণীর ধারে আট বৎসরের একটী শিশু খেলা করিতে করিতে দৈবাৎ জলে পতিত হয়, এবং গভীর জলে নিমগ্ন হয়। হরেন্দ্রনাথ সান্যাল নামক এক বালক এই ঘটনা শুনিবামাত্র নিজ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ জলে ঝম্প দিয়া পড়িল, এবং গভীর জলমধ্যে বারংবার নিমগ্ন হইতে লাগিল। শেষে বীরবালক হরেন্দ্র ১৪ ফিট জলমধ্য হইতে সেই মুমূর্ষু শিশুটীকে উদ্ধার করিয়া আনিল। বহু শুশ্রূষায় সেই অচেতন শিশুটী প্রাণ পাইল। ধন্য হরেন্দ্র! এই একটী কার্য্য দ্বারা তোমার সমস্ত জীবন পুণ্যময় হইল। যথায় নিঃস্বার্থ পরহিতে আত্মবিসর্জ্জন, তথায় করুণাময়ের করুণা প্রত্যক্ষ। মঙ্গলময় ঈশ্বর ধর্ম্মপ্রাণ হরেন্দ্রকে অক্ষয় নিরাময় জীবন দান করুন।

২। ভারতবর্ষের অনেক পুরাতন শিল্প, অর্থ ও উৎসাহের অভাবে লুপ্ত হইতেছে, ইহার যথার্থ কারণ অনুসন্ধানের জন্য ভারতের নানা বিভাগের শাসনকর্ত্তারা কতিপয় উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসন্ধান বিবরণ পাইলে গবর্ণমেণ্ট লুপ্ত শিল্পের উদ্ধারের ব্যবস্থা করিবেন।

৩। মৎস্যব্যবসায় শিক্ষার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বার্ষিক ৩ হাজার টাকার এক বৃত্তি লইয়া বিহারের সৈয়দ মহম্মদ যাসিন আমেরিকায় যাইতেছেন।

৪। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে কাশীধামে ক্ষত্রিয় বালকদের শিক্ষার জন্য ভিঙ্গার রাজা উদয় প্রতাপ সিংহ ৩॥০ টাকা সুদের ১০ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ দান করিয়াছেন। স্কুলে যোগদান করিবার পূর্ব্বে শিক্ষক ও ছাত্রগণ রাজভক্ত থাকিবেন বলিয়া কোন ও মাজিষ্ট্রেটের নিকট অঙ্গীকার করিবেন।

৫। এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর এক দফা এফ্‌, এ এবং বি, এ, পরীক্ষা গৃহীত হইবে। এই দ্বিতীয় বার পরীক্ষার দিন আগামী ৭ই ডিসেম্বর সোমবার ধার্য্য হইয়াছে।

৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং সাধা-

রণের আইন শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, এবং অন্যান্য কালেজ হইতে আইন অধ্যাপনা তুলিয়া দিবেন।

৭। মহা প্রভাবী আনিবেসাণ্ট দেবী বর্ত্তমান ছাত্রগণের ধর্ম্মপ্রাণতার অভাব বিশিষ্ট রূপে অনুভব করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র ছাত্রগণের ধর্ম্মজীবন গঠনের জন্য সভা স্থাপন ও বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি উচ্চ। ঈশ্বর তাঁহার এই সদুদ্দেশ্য সফল করুন।

৮। ভারতে পর্শি জাতীর সংখ্যা অল্প হইলেও তাহাদের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। এক্ষণে পর্শিরা আপন বালকবৃন্দের শিক্ষার জন্য একটী কলেজ স্থাপনের উৎযোগ করিতেছেন। উহার শিক্ষা প্রণালী বেণারস সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের নিয়মানুযায়িনী হইবে। এই জাতির উন্নতির চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়।

৯। বিহারে পুরনারীগণের শিক্ষার জন্য বেটিয়ার মহারাজ তাঁহার পত্রিবাট স্থানে স্থানে বৃহৎ কুঠি ও দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে মহাশয়ের এরূপ অনুরাগ ও বদান্যতা অতি শুভ লক্ষণ।

১০। শিবপুরে রামকৃষ্ণ দরিদ্র ভাণ্ডার বিষয়ে এবারকার বর্ষিক বিবরণ পাঠে জানা যায় উক্ত সভার প্রযত্নে বহুতর দুর্ভিক্ষ পীড়িত দরিদ্র সাহায্য লাভ করিয়াছে। উক্ত সভার সভ্যগণের উৎসাহ ও ঐকান্তিক চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। এ ঘোর দুর্ভিক্ষে যাঁহার চেষ্টায় অনশন মুমূর্ষু একটী প্রাণীরও প্রাণ রক্ষা হয় তিনি ধন্য।

১১। পুনার সম্বাদ পত্রে রাজদ্রোহ সূচক লেখার জন্য খ্যাতনামা বালগঙ্গাধর তিলকের নামে যে তুমুল মামলা চলিতেছিল তাহাতে তিলক স্বপক্ষে কোন উকিল বা বারিষ্টার নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং আত্ম পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। জুরির বিচারে তিলকের ছয় বৎসর দ্বীপান্তর ও এক হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। তিলকের এই বিপদে সকলেই ব্যথিত।

বামারচনা।

আকুল প্রার্থনা।

হা দেব দেবেশ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারি!
তোমারে চিনিতে কেন এবে নাহি পারি।
তোমার আদেশে কেন চক্ষে বহে জল,
তোমার প্রদত্ত দানে ফাটে বক্ষঃস্থল।
অশ্রুবারি নহে কিহে তব স্নেহরস,
সিঞ্চিয়া দগধ প্রাণ, কররে বিবশ।
শোক দুঃখ ব্যথা জ্বালা দেও হাতে ধরি,
তবে কেন আমি প্রভু! বহিতে না পারি।
আকুল চঞ্চল হিয়া হয় অবিরাম
বুঝেনা বিবেকবাণী, হত মনস্কাম।
ঘটে যথা অহরহ বিচ্ছেদবিরহ,
পরিপূর্ণ কর নাথ! সেই শূন্য গেহ।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

আবেদন।

কতবার ও চরণে ঢালিয়াছি অশ্রুধার,
অনাথ শরণ বলে ডাকিয়াছি কতবার।
অভাগীর এ বেদনা কাতর করুণ বাণী
শুনিলেনা চাহিলেনা, হে বিভু জগতস্বামী!
হৃদয় যে ভেঙ্গে চুরে হয়ে গেল্‌ছাই থাক্‌,
অনল লুকায়ে রাখি যাতনা নীরবে থাক্‌।
এ নিরুদ্ধ হৃদয়ের এ গভীর হাহাকার
ফুরাবে কি এজনমে বল ওহে স্নেহাধার!

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

অনন্তরূপিণী নারী।

হে রমণি! তব অন্ত কে কহিতে পারে।
অনন্ত-রূপিণী তুমি সংসার মাঝারে॥
কোন গৃহ তব গুণে স্বর্গ তুল্য হয়।
তোমারি গুণেতে কোন গৃহস্থ মজয়॥
কোন্ পতি তোমা হতে জীবন্মুক্তহন।
কোন ভাগ্যহীন মজে তোমারি কারণ॥
লৌহেরে করিতে স্বর্ণ ক্ষমতা তোমার।
তব গুণে ধরে স্বর্ণ লৌহের আকার॥

আর্য্য নারী।

প্রণমামি হিন্দুনারি! চরণে তোমার।
পাতিব্রত্য ধর্ম্মে তুমি আদর্শ সবার॥
উজ্জ্বল হিন্দুর মুখ ধর্ম্মেতে তোমার।
তোমার কোমল প্রাণ গুণের আগার॥
অন্যান্য জাতির পতি হাটেতে বিকায়।
হিন্দু ললনার স্বামী ঈশ্বর ধরায়॥

মিসেস এম্‌ সিংহ।

বর্ষশেষে।

(আরাধ্যতম ৺ বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয়ের স্বর্গারোহণ-স্মৃতি)

১

আজিকার মত থাক্ সব কাজ,
আজি যে সে বর্ষশেষ—
দয়াময় গুরু, স্নেহময় পিতা,
গিয়াছেন পরদেশ।

২

দিবা নিশা সহ রবি-শশী-তারা
আসে যায় ধীরে ধীরে,
আমাদের সেই স্নেহের দেবতা,
আর না আসিলা ফিরে!

৩

ভুলে আজো খুঁজি সে সৌম্য মুরতি,
সে কথা অমৃতময়,
সস্মিত-আননে ধর্ম্ম-উপদেশ,
উছলিত বরাভয়!

৪

বজ্ররবে কহে নিরাশা রাক্ষসী
"এ জনমে আর নহে"
এতই কঠিন মানব-পরাণ
কতই আঘাত সহে॥

৫

এক বর্ষ আজি—সেই শুভাশীষ
না পাইনু শিরোপরি,
তৈলাভাব যেন জীবন-প্রদীপে,
কে নেছে শকতি হরি।

৬

এক বর্ষ আজি—সে আদর মাখা
পত্র নাহি আসে আর,
প্রতি ছত্র আহা স্বরগ সৌরভ
শত স্নেহ করুণার!

৭

এক বর্ষ আজি—এ আষাঢ় মাসে
সিত নবমীর নিশা,
অমূল্য রতন হরি'নিল চোরে
আঁধারিয়া দশ দিশা।

৮

হরি নিল চোর, ভারত-গৌরব,
বঙ্গের বক্ষের ধন,
বঙ্গবাসিনীর স্নেহের আশ্রয়——
পিতা ভ্রাতা সখা জন!

৯

নিরাশ্রয় ধর্ম্ম, শক্তিহীন কর্ম্ম,
অনাথ সন্তানগণ,
বামাবোধিনীর হিয়া শত চীর,
জীবন্মৃত বন্ধু জন!

১০

দেখ চাহি দেব! তোমার বিহনে,
বহে কত অশ্রুধার,
সব আছে তবু শূন্যময় সবি,
ভরা মৌন হাহাকার!

১১

দেব-দেশে গেছ দেবতা হয়েছ
বিভুর বিশ্বাসী ছেলে,
তবু পোড়া মন মানেনা প্রবোধ
তবু কাঁদি "কোথা গেলে!"

১২

তুমি ছিলে, ধরা ছিল সুধাভরা
প্রাণে ছিল কত বল,
তুমি ছিলে তাই কত ভরসায়
ভরা ছিল হৃদি তল।

১৩

এক বর্ষ আজি—সায়াহ্নে যেমতি
নিবে রবি-কর-লেখা
তেমনি নিবিছে আয়ু আশা-আলো
আমরা রয়েছি একা।

১৪

জরামৃত্যুময়ী অবনী ত্যজিয়া
রয়েছ অমর ধামে,
ভকতি প্রণতি প্রদানি চরণে,
ও পবিত্র পুণ্য নামে।

১৫

দেব-দেশে গেছ দেবতা হয়েছ,
বিভুর বিশ্বাসী ছেলে,
স্বার্থপর মন, মানেনা বারণ
তাই কাঁদি "কেন গেলে?"

প্রণতা
স্নেহের কন্যা
শ্রীমা—

গ্রাহকগণের প্রতি।

১৩১৫ সালের ৩ মাস গত হইল, সহৃদয় গ্রাহকগ্রাহিকাগন পত্রিকার অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। যাঁহাদের নিকট সাবেক মূল্য বাকি আছে তাঁহারা অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। যাঁহাদের নিকট এক বৎসরের অধিক কালের মূল্য বাকি আছে তাঁহাদের নিকট পত্রিকা ভিঃ, পিঃ ডাকে প্রেরিত হইলে গ্রহণ করিবেন; ভিঃ, পিঃ, ফেরত দিলে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়। গ্রাহকগণ নিজ নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন জানাইতে ভুলিবেন না। ঠিকানা না জানাইলে পত্রিকা হস্তগত না হইলে আমরা দায়ীত্ব লইব না।

বামাবোধিনীর	অগ্রিম দেয় বার্ষিক	মূল্য	„	„	„	২৸৵০
ঐ	ঐ ষাণ্মাসিক	ঐ	„	„	•	১৷৴০
ঐ	পশ্চাৎ দেয় বার্ষিক	ঐ	„	„	„	৩৲
ঐ	এক খণ্ডের নগদ	ঐ	„	„	„	।০

এক খণ্ডের মূল্য ।০ পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভার, কভারের সম্মুখস্থ পেজ বামাবোধিনীর মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকারের পেজের ও নিয়মাবলীর সম্মুখস্থ পেজ, পত্রিকার প্রথম ও শেষ পেজের (Reading Matter এর) সম্মুখস্থ পেজের প্রত্যেক পেজ মাসিক „ „ „ „ ৪৲

২। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পেজ „ „ „ „ „ „ ৩৲

অর্দ্ধ পেজ „ „ „ „ „ „ ২৲

পেজের চতুর্থাংশ „ „ „ „ „ ১৷৷০

৪। বিজ্ঞাপন এক বৎসরের অধিক কালের জন্ত স্থায়ী হইলে মূল্য নিরূপণ জন্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

রুচি বিরুদ্ধ কোন বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম ও নগদ দেয়।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
৯নং আন্টনীবাগান লেন,
কলিকাতা।

শ্রীশিপ্রচরণ বসু,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

২০।০ মদন মিত্রের লেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 540. August, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪০ সংখ্যা। { শ্রাবণ, ১৩১৫। আগষ্ট, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

তার বিভাগের বেতন বৃদ্ধি—তার বিভাগের কর্ম্মচারীরা তাহাদের গুরুতর পরিশ্রমের জন্য বেতন বৃদ্ধির আবেদন করিয়া কোন ফললাভ না করায় সকলে একযোগে কার্য্যত্যাগ করিয়াছিল। ভারতগবর্ণমেণ্ট এই সকল কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

বিদ্রোহিদিগের দণ্ড—কাবুলের আমীরের যে সকল প্রজা সীমান্ত যুদ্ধে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল; আফগানিস্থানের গ্রামে গ্রামে তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহারা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে।

রাজনিমন্ত্রণ—সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড প্রায় নয় সহস্র গণ্য মান্য প্রজাকে ইংলণ্ড-উইণ্ডসর প্রাসাদে উদ্যান-বিহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রণে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অন্যতর নেতা, পার্লামেণ্টের সভ্য মিঃ কেয়ার হার্ডির নাম বাদ দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তি একযোগ হইয়া সম্রাটের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, এবং যতদিন মিঃ কেয়ার হার্ডির নাম নিমন্ত্রিতের তালিকায় না উঠিবে, তত দিন তাঁহারা রাজকীয় কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন না।

অশোক-স্মৃতি—মহারাজ অশোকের প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ বিহার ও প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিহারে রাজগিরি প্রদেশে বর্ত্তমান আছে। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে সেই পুণ্য-স্মৃতি রক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

আইন কলেজ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়ম অনুসারে কলিকাতায় একটীমাত্র আইন কলেজ থাকিবে, এবং সেখানে সকলে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে এইরূপ স্থির হয়। ইহার বিরুদ্ধে

অনেক প্রতিবাদ হওয়ায়, শুনা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এক আদর্শ আইন কলেজ স্থাপিত হইবে, কিন্তু আর কেহ কোথাও আইন কলেজ করিতে পারিবে না এরূপ নিয়ম করা হইবে না।

শোক সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, সঞ্জীবনীর অন্যতম সত্বাধিকারী বাবু কালীশঙ্কর সুকুল মহাশয় গত ২৬শে আষাঢ় শুক্রবার ৫২ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন ও শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দান করুন।

ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তার—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কুমারী নির্ম্মলিনী বসু নাম্নী জনৈকা মহিলা এ বৎসর বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে এই প্রথম ভারতীয় মহিলা বি, এ, উপাধি লাভ করিলেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার কুমারী শিশিরকুমারী গুহ ও কুমারী শৈলবালা সমদ্দার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গত এফ, এ, পরীক্ষায়, ও কুমারী প্রতিভা গুহ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট প্রথমোক্ত দুই বালিকাকে বেথুন কলেজে বি, এ, পড়িবার জন্য ১০৲ টাকা ও শেষোক্ত বালিকাকে এম, এ, পড়িবার জন্য ৩০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

তাহার পর প্রাতে উঠিয়া যথারীতি গৃহকার্য্য করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে আরো দুই চারিজন ওঝা আসিয়া নানারূপ পরীক্ষা করিয়া বলিল যে, সর্পাঘাত নহে, তাঁহার শরীরে বিষের নামগন্ধও নাই। আমরা সকলে নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার আত্মীয়াও প্রফুল্লমনে সহাস্যবদনে গৃহ-কার্য্যে লিপ্তা রহিলেন। অনেক বেলায় দূর হইতে আর একজন ওঝা আসিল। আমার আত্মীয়া বলিলেন,—"আর আবশ্যক কি? আমি বেশ আছি, আমার শরীরে কোনও অসুখ নাই।" আমরা বলিলাম, ইনি যখন দূর হইতে কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তখন আর একবার দেখা যাউক না কেন? ওঝা হাত চালিয়া বলিল,—"সর্পাঘাত বটে; শরীর বিলক্ষণ বিষাক্ত হইয়াছে।" ওঝা যেই এই কথা বলিল, আমার আত্মীয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"ঠিক্ কথা, আমার পা অল্প অল্প চিন্‌চিন্ করিতেছে।" কিছুক্ষণ পরে আবার বলি-লেন,—আমার পা অসাড় হইয়া আসি-তেছে। অল্পক্ষণ পরে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, দুই ঘণ্টা পরে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। হায়! আমরা যদি ঐ নূতন ওঝা দ্বারা পরীক্ষা না করা-ইতাম, তাহা হইলে এ দুর্ঘটনা ঘটিত না।

আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, ঐ প্রসিদ্ধ ওঝার কথা আমার আত্মীয়ার মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল এবং সেই একান্ত বিশ্বাসের ফলেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

আর দুইটী ঘটনা আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট। উভয় স্থলেই, অন্ধকারে আমাকে সর্পে দংশন করিয়াছে, এই বিশ্বাসে তাহাদের দেহে সর্পাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহাদের জীবনের আশা ছিল না। ইত্যবসরে আমার সোদরাগ্রজ অতুল প্রতিভাশালী ৮ কলীকুমার তথায় উপস্থিত হইয়া, পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—উহা সর্পাঘাত নহে। এই বিশ্বাস তাহাদের মনে যেই দৃঢ়বদ্ধ হইল, অমনি তাহাদের বিষলক্ষণ ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে লাগিল। তাহাদের প্রাণরক্ষা হইল।

কয়েক বৎসর গত হইল, খুলনা জেলায় এক স্কুলের বালক তাহার পিতামাতাকে বলিল;—"আগামী জন্মাষ্টমীর দিন আমার মৃত্যু হইবে!" পিতা-মাতা তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, প্রাণপণযত্নে তাহার সে বিশ্বাস দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বালক সে কথা শুনিল না। তিন চারি মাস পূর্ব্ব হইতে সে একান্ত মনে ভাবিতে লাগিল যে,—আগামী জন্মাষ্টমীর দিন আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। ফলে তাহাই হইল। অনেক স্থানে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। এইরূপ বিশ্বাসের একাগ্রতাবশতঃ, কোনও কোনও স্থলে মৃত্যু না হইলেও, শরীরে উৎকট ব্যাধির উৎপত্তি হয়। আবার যে ব্যক্তি মনে যেরূপ চিন্তা করে, তাহার শরীরে সেই চিন্তার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। যীশুখৃষ্টকে লোকে ক্রুশে নিহত করিয়াছিল। তাঁহার দুই হাতে ও দুই পায়ে পেরেক পুতিয়া তাঁহাকে ক্রুশকাষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিল। তদুপরি এক-জন সৈনিকপুরুষ তাঁহার পঞ্জরের দুই পার্শ্বে বল্লম দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। হিন্দু-ভক্তেরা যেরূপ শিব-দুর্গা, সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতির মূর্ত্তি ধ্যান করেন, সেইরূপ রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অনেক পবিত্রাত্মা নরনারী বিরলে বসিয়া একান্ত-ভাবে যীশুর সেই ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তি ধ্যান করেন। এই ধ্যানের ফলে কোনও কোনও নরনারীর হস্ত, পদ ও দুই পার্শ্বে পেরেক ও বল্লমের ক্ষতচিহ্ন সকল প্রকাশ পাইয়া তাহা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। মনুষ্য-শরীরে এইরূপ ক্ষত চিহ্ন প্রকাশিত হওয়াকে ইংরাজিতে "ষ্টিগমেটা" (Stigmata) বলে। সাত আট শত বর্ষ পূর্ব্বে যখন ধর্ম্মের প্রতি মনুষ্যের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অতি প্রবল ও প্রগাঢ় ছিল, তখন এই ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিত। এক্ষণে সচরাচর না হইলেও, মাঝে মাঝে ঘটিতে শুনা যায়। আল্‌ভার্ণো নামক পর্ব্বতে কোনও মঠে ফ্রান্‌সিস্ নামক এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। যীশুর শেষ অবস্থা ধ্যান করিতে করিতে তিনি একদিন বিভোর হইয়া পড়িলেন। সেই সমাধির অবস্থায় দেখিলেন যে,—জ্যোতির্ম্ময়-দেহধারী, ছয়টী-পক্ষ বিশিষ্ট এক স্বর্গীয় দূত আকাশ হইতে অবতরণ

করিতেছেন। তাঁহার সেই পক্ষের ভিতর ক্রুশবিদ্ধ এক নরমূর্ত্তি ছিল। স্বর্গীয় দূত নিম্নে নামিয়া সন্ন্যাসী ফ্রান্সিস্‌কে স্পর্শ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। সন্ন্যাসীর হৃদয় অপূর্ব্ব প্রেমরসে প্লাবিত হইল। তিনি বিহ্বল হইলেন। তাহার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার নিজের হস্তে, পদে ও দুই পার্শ্বে সুস্পষ্ট ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে। দুই হস্তে ও দুই পদে চারিটী ক্ষত-স্থান মাংসনির্ম্মিত পেরেক দ্বারা বিদ্ধ হইয়া আছে এবং ঐ পেরেকের মস্তক কিছুদূর বাহির হইয়া আছে। দুই পার্শ্বের ক্ষত স্থান গাঢ় লোহিত বর্ণের ছিল। বল্লম দ্বারা আহত হইলে যেরূপ দেখায়, সেইরূপ দেখাইতে ছিল। ঐ কয়টী ক্ষত স্থান হইতে মাঝে মাঝে রুধিরধারা বিগলিত হইত। ঐ ঘটনার দুই বৎসর পরে ফ্রান্সিস্ স্বর্গারোহণ করেন।

ভেরোনিকা গিউলানী নামক এক স্ত্রীলোকের শরীরে প্রথমে ক্রুশচিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু যীশুকে বধ করিবার পূর্ব্বে যিহুদীরা তাঁহার মস্তকে যে কণ্টক-নির্ম্মিত মুকুট পরাইয়াছিল, ঐ স্ত্রীলোকের মস্তকে সেই মুকুটের ক্ষতচিহ্ন প্রথমে প্রকাশ পায়; অনন্তর ক্রুশচিহ্নগুলি বাহির হইয়াছিল। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে গাব্রিয়েলা, ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে ক্লেরা, ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে সিসিলিয়া, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে কেথেরিণা, এইরূপ অনেক স্ত্রীলোকের শরীরে ক্রুশের আঘাত-চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল।

প্রায় দেড়শত বৎসর গত হইল, জার্ম্মণি দেশে মেস্‌মার নামক এক ডাক্তার এক নূতন বিদ্যার আবিষ্কার করেন; ইহাকে লোকে মেস্‌মেরিসম্ (mesmerism) বলিত। আজকাল উহাকে হিপ্‌নোটিসম্ (Hypnotism) বলে। কিন্তু মেস্‌মেরিসম্ ও হিপ্‌নোটিসম্, এই দুই বিদ্যার কিছু পার্থক্য আছে। এই বিদ্যার প্রভাবে লোকের মানসিক শক্তিকে প্রশমিত অথবা উত্তেজিত করিতে পারা যায়, স্নায়বীয় বিকারঘটিত নানাপ্রকার রোগ হইতে লোককে মুক্ত করিতে পারা যায়। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়সকলকে লোকে যেরূপ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, হিপ্‌নোটিক্ ব্যক্তিও সেইরূপ সকল বিষয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। সেই অবস্থায় কল্পিত বিষয়কে সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইলে, তাহার ফলও ফলিয়া থাকে। মানুষ কখনও কখনও আপনাআপনি হিপ্‌নোটিক্ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইংরাজিতে ইহাকে Self Suggestion বলে (১)। এ দেশে

(১) এইরূপ ও অন্যরূপ বহুতর বিদ্যা এদেশে নানা 'তন্ত্র' নামে প্রচলিত ছিল। যথা; ফেৎকারিণীতন্ত্র, উড্ডীশতন্ত্র, ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্র, গুপ্তসাধনতন্ত্র, গন্ধর্ব্বতন্ত্র, ইত্যাদি। এই সকল তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াদ্বারা, মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, আকর্ষণ, স্তম্ভন, বিষহরণ, রোগহরণ, নষ্টোদ্ধার, রোগশান্তি, নানা ভৌতিক কাণ্ড প্রভৃতি অশেষবিধ অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদিত হইত। আমরা স্বচক্ষে ইহার কয়েকটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, ঐ সকল বিদ্যার আচার্য্যেরা নিজ নিজ বিদ্যা নিজমধ্যেই গূঢ়

উহাকে "দশা পাওয়া" বলে। এই অবস্থায় কোনও একটী বিষয়ে বিশ্বাস মনে প্রগাঢ়-ভাবে বদ্ধমূল হইয়া যায়, এবং সেই বিশ্বাসের প্রভাবে শরীরের উপরও তাহার ফল হয়। যেমন খুলনার সেই বালকের মনে এ কান্ত বিশ্বাস হইয়াছিল, সে জন্মাষ্টমীর দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইবেই। তীব্র আলোকের দিকে বা কোনও একটা উজ্জ্বল বস্তুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলেও মানুষ এইরূপ হিপ্নোটিক্ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায়, মানুষ, হয় নিদ্রায় অভিভূত, অথবা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। হিষ্টিরিয়া-রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকেরা কখনও কখনও হিপ্নোটিক্ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সে সময় তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল অতি প্রবল হইয়া উঠে। এই কলিকাতায় একজন স্ত্রীলোক হিষ্টিরিয়া অবস্থায় অতি দূর হইতে লোকের ঈষৎ পদশব্দ শুনিয়া, কে আসিতেছে তাহা বলিতে পারিতেন। অন্য লোকে সে শব্দ শুনিতে পাইত না। ইহার মূলে চিত্তের একাগ্রতার শক্তি আছে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে,—শিশু স্তন্যের জন্য কাঁদিতেছে, তাহার মাতা আসিতেছেন, তাহার মাতার পদশব্দ কাহারও কর্ণগোচর হইল না, কিন্তু সুদূর হইতেই সেই অব্যক্ত মাতৃপদশব্দ শিশু জানিতে পারিল ও রোদনে ক্ষান্ত হইয়া সেইদিকে চাহিতে লাগিল। সিপাহী-বিদ্রোহকালে, লক্ষ্ণৌনগরের দুর্গমধ্যে বহুসংখ্যক সাহেব, বিবি আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিদ্রোহীরা উক্ত দুর্গে অবিশ্রান্ত গুলি চালাইতে লাগিল। ক্রমে অবরুদ্ধগণের রসদপত্র সকলি ফুরাইল। সে গুলিবর্ষণের মুখে দুর্গ আর কতক্ষণ টিকিবে? সকলেই প্রাণের আশা ছাড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক বিবি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"আমাদের উদ্ধার-কর্ত্তারা আসিতেছেন। ঐ তাঁহাদের উদ্ধারসূচক-সুরের বাদ্য শুনিতেছি! কিন্তু সে বাদ্য আর কেহই শুনিতে পাইল না। ফলতঃ উদ্ধারার্থী ইংরাজসৈন্য তখন লক্ষ্ণৌনগর হইতে দশ ক্রোশ দূরে। কয়েক ঘণ্টা পরে উদ্ধারকারীরা ঠিক্ সেই সুরে বাদ্য করিতে করিতে আসিয়া সকলকে উদ্ধার করিলেন।

যিনি এক ব্যক্তিকে হিপ্নোটিক্ অবস্থায় পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঐ ব্যক্তির মস্তক হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত নিজের দুই হস্ত সঞ্চালন করিয়া, তাহার মধ্যে ঐ শক্তি সঞ্চারিত করেন। ঐরূপ হস্তসঞ্চালনক্রিয়াকে পাস্ (Pass) দেওয়া বলে। কিন্তু অনেক সময়ে তাহাও করিতে হয় না। হিপ্নোটিক্ বিদ্যায় যাঁহাদের বিশেষ দক্ষতা জন্মিয়াছে, তাঁহারা

রাখিতেন, সহজে কাহাকেও শিখাইতেন না। পাছে অপাত্রে পড়ে, এই ভয়ে অনেকে শিখাইতেন না। অন্যে শিখিলে পাছে নিজের প্রতিপত্তির হানি হয়, এই ভয়েও অনেকে শিখাইতেন না। এই কারণে ক্রমশঃ গুরুধারা লোপ পাইয়াছে। সর্পচালা, নলচালা ও ভূতচালা ঘটিত কয়েকটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছিলাম।

তদুপযুক্ত মানসিক অবস্থার ব্যক্তিকে পাইলে, পাস্ না দিয়াই আপনার মনের ভাব তাহার মনে সংক্রামিত করিতে পারেন। সম্প্রতি পারিস্ নগরে এইরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছে। কোনও হিপ্‌নোটিক্ ডাক্তার এক বন্ধুর সহিত ট্রাম-গাড়িতে যাইতে ছিলেন। সেই গাড়িতে এক অবিবাহিতা যুবতী ছিলেন। ডাক্তার তাঁহার বন্ধুর কাণে কাণে বলিলেন,—"আমি এই স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিব না, ইহার উপর পাস্ দিব না, ইহার সহিত একটী কথাও কহিব না, অথচ ইহাকে হিপ্‌নোটাইজ্ করিয়া আমার সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি।" বন্ধু কহিলেন, "পাস না দিয়া আপনি তাহা করিতে সমর্থ হইবেন না।" এই বাদানুবাদের পর, দূর হইতে অপরিচিত লোককে হিপ্‌নোটাইজ্ করিতে পারা যায় কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য, ডাক্তার আপনার মনে একান্তভাবে চিন্তা করিলেন যে,—"এই স্ত্রীলোক হিপ্‌নোটাইজ্ হউক এবং আমার সঙ্গে আমার বাসায় চলুক।" ফল তাহাই হইল। তিন জনে ট্রামগাড়ি হইতে নামিলেন। স্ত্রীলোক নিজের বাটীতে না গিয়া, ডাক্তারের সঙ্গে তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন। বাটীতে গিয়া ডাক্তার তাঁহাকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত করিয়া, তাঁহার নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। এ দেশের তন্ত্রশাস্ত্রে ইহা বশীকরণবিদ্যার অন্তর্গত, 'আকর্ষণ' নামে অভিহিত। অনেক সময় হিপ্‌নোটাইজ্ ব্যক্তির অন্য সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকে, কেবল এক বিষয়ে জ্ঞান থাকে না। যেমন ধর,—তুমি একজন হিপ্‌নোটিক্ ডাক্তার, তুমি চারি দিন পূর্ব্বে হইতে এক জনের মনে ধারণা করিয়া দিলে যে,—সে রবিবার বেলা ৩ টার সময় অমুককে 'কুকুর' বলিয়া গালি দিবে।" ঐ চারিদিন সে লোক ক্রমাগত প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল,—"আমি এ কাজ প্রাণান্তেও করিব না।" কিন্তু রবিবার ৩ টার সময় সে কিছুতেই থাকিতে পারিল না। নিজের মনের উপর কর্তৃত্ব সে সম্পূর্ণভাবে হারাইল; সেই লোককে তখন ঐরূপ গালি না দিয়া সে থাকিতে পারিল না। এই হিপ্‌নোটিক্ বিদ্যার বলে কোনও কোনও দুর্বৃত্ত, স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ করিয়াছে, এক জনের দ্বারা অন্য লোককে খুন করাইয়াছে। এইজন্য, অষ্ট্রীয়া, বেল্‌জিয়ম্ প্রভৃতি দেশে সচ্চরিত্র ডাক্তার ভিন্ন অন্য দ্বারা হিপ্‌নোটাইজ্ করা, আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে। যাহাদের নিদ্রা হয় না, হিপ্‌নোটাইজ্ দ্বারা তাহাদের বিশেষ উপকার হয়। তাহাদিগকে হিপ্‌নোটাইজ্ করিয়া, ডাক্তার তাহাদের মনে এই চিন্তা বদ্ধমূল করিয়া দেন, যে, "আমি চক্ষু চাহিতে পারি না, এই মুহূর্ত্তেই আমি নিদ্রায় অভিভূত হইব।" বস্তুতঃ তাহাই হয়। অভ্যাসদোষে যাহারা সুরা পান না করিয়া থাকিতে পারে না, সুরার উপর তাহাদের মনে বিতৃষ্ণা জন্মাইতে পারা যায়। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল

কলিকাতার মেডিকেল কলেজে এক ব্যক্তিকে হিপ্‌নোটাইজ্‌ করিয়া তাহার উপর বিষম অস্ত্রপ্রয়োগ করা হয়। রোগীর সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল, কিন্তু সে অস্ত্রাঘাতের কিছুমাত্র যাতনা অনুভব করে নাই। অপর দিকে, লোকের মনে মিথ্যা চিন্তা বদ্ধমূল করিয়া দিলে তাহারও ফল ফলিয়া থাকে। কোনও লোককে হিপ্‌নোটাইজ্‌ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে সামান্য একখানি কাগজ বসাইয়া ডাক্তার যদি বলেন,—"তোমার বুকে আমি বেলেস্তারা (Blister) দিলাম।" কিছুক্ষণ পরেই রোগী সত্যসত্যই জ্বালা অনুভব করিবে। তাহার বক্ষঃস্থল লাল হইবে এবং ফোস্কা হইবে। হিপ্‌নোটিক্‌ অবস্থায় কোনও কোনও লোকের আভ্যন্তরিক ঐশী শক্তি উদ্দীপিত হয়। এরূপ অবস্থায় কেহ কেহ, দূরদেশে যাহা ঘটিতেছে, তাহা দেখিতে পায়। এইরূপ দূরদৃষ্টিকে ইংরাজিতে ক্লেয়ারভয়েন্স (Clairvoyance) বলে। কোনও কোনও লোক দূরের শব্দ শুনিতে পায়। ইংরাজিতে ইহাকে ক্লেয়ারঅডিএন্স (Clairaudience) বলে। কেহ কেহ অন্য লোকের মনের ভাব বুঝিতে পারে, অথবা আপনার মনের চিন্তা অন্য লোকের মনে পরিচালিত করিতে পারে। এরূপ পরিচালনকে টেলিপ্যাথি (Telepathy) বলে। এই সকল শক্তি কোনও কোনও লোকের সহজ অবস্থাতেও উদ্ভূত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

হারানিধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

উমার পিতা মাতার কোনই অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না। তাহার প্রধান কারণ, উমাকে তাহার পিতামাতা সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে এমন ব্যাকুল ভাবে রোদন করিত যে, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করাই দায় হইত। নির্ব্বোধ বালিকা বুঝিত না যে, ইহাতে তাহারই অনিষ্ট হইতেছে। আমাদের যতদূর সাধ্য অনুসন্ধানের ত্রুটি করি নাই। কিন্তু উমার অদৃষ্টক্রমে সমস্তই নিষ্ফল হইল।

আমার মাতা ঠাকুরাণী উমাকে যতদূর ভাল বাসিতে হয় বাসিতেন। নিজ কন্যার ন্যায় আদর, যত্ন, স্নেহ করিতেন; কিসে উমার ম্লানমুখে হাসি আনিবেন, এই চেষ্টা সর্ব্বদা করিতেন। আমি ইহা দেখিয়া পরিতুষ্ট হইতাম। আমি কিন্তু উমার একটী বিশেষ ভাব লক্ষ্য করিলাম। সে প্রথম প্রথম আমার নিকট যেমন অসঙ্কোচে আসিত, গল্প করিত, এখন আর সে ভাব নাই। আমাকে দেখিলে পলায়ন করে এবং তাহার ক্ষুদ্র সুন্দর মুখখানি লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠে। কোন

কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সহজে উত্তর দেয় না। তাহার এ ভাবের কোন কারণ আমি ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিলাম না। সত্য কথা বলিতে কি, আমি উমাকে ভাল বাসিয়াছি। কিন্তু সে কি জাতি, কাহার কন্যা, এ সব একবারও ভাবিয়া দেখি নাই। প্রণয়ের রীতিই বুঝি এই যে, পাত্রাপাত্র বাছিয়া লইবার শক্তি পর্য্যন্ত থাকে না। এদিকে আমার বিবাহ বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তাহার কারণ আমি যে দিন কলিকাতা হইতে বাটী আসিতেছিলাম, সেই দিন যে প্রবল ঝটিকা হয়, তাহা বোধ হয় পাঠক পাঠিকার স্মরণ আছে।

সেই দিন সেই দুর্যোগে যে কত লোক অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, কত লোক উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? সেই দিনের সেই দুর্য্যোগের মধ্যে আমার ভাবী শ্বশুর মহাশয় স্ত্রী কন্যা লইয়া শ্বশুরালয় হইতে বাটী ফিরিতেছিলেন। সহসা ঝটিকাঘাতে নদীবক্ষে নৌকা মগ্ন হয়। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী কোন প্রকারে উদ্ধার পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কন্যাটীকে পাওয়া যায় নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, আমার বিবাহ বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছি। কিন্তু ক্ষণপ্রভার ন্যায় আমার হৃদয়ে এক এক বার আশার বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিত। আমি ভাবিতাম যাহাকে আমি উদ্ধার করিয়াছি, সেই উমাই কি আমার জলমগ্না ভাবী পত্নী?

এক দিবস আমার শয়নকক্ষে বসিয়া এই সব ভাবিতে ভাবিতে আমার মস্তিষ্ক এত দূর বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইল যে, আমি আর কোনমতে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গবাক্ষপথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। শীতল বায়ুস্পর্শে মস্তিষ্ক শীতল হইল এবং মনের অবসন্নতা অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। তখন এক খানি পুস্তক পড়িবার মানসে আলমারী খুলিয়া যেমন পুস্তক লইতে গিয়াছি, নিকটেই কাঁচের একটী ফুলদানী ছিল, অসাবধানতা বশতঃ পড়িয়া গিয়া তাহা শতধা চূর্ণ হইল। পুষ্পাধার-পতনের শব্দের সহিত উমা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু আমাকে দেখিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল। আমি বলিলাম, "উমা যাইও না, একটা কথা শুন।"

উমা অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি বলিলাম, আসিয়াই যে চলিয়া যাইতেছিলে? কোন দরকার আছে কি?"

উমা মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার ঘরে কিসের শব্দ হইল তাই দেখিবার জন্য মা পাঠাইয়াছেন।" উমা আমার মাকে মা বলিত।

আমি বলিলাম, "কিসের শব্দ হইল কারণ না জানিয়া আমাকে দেখিয়া চলিয়া যাইতেছিলে, মাকে গিয়া কি বলিতে? আমাকে এত ভয় কিসের উমা?" উমা নত মস্তকে নীরবে রহিল।

আমি বলিলাম "ফুলদানীটা পড়িয়া

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই শব্দ হইয়াছে, অমন সুন্দর ব্রবাটী মিথ্যা নষ্ট হইল।" উমা আবার প্রস্থানে উদ্যত হইল। আমি পুনরায় যাইতে নিষেধ করিলাম। অদ্য আমার মনের কথা উমাকে বলিব, এবং উমা আমাকে ভাল বাসে কিনা জিজ্ঞাসা করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিলাম, "দেখ উমা! আজ তোমাকে আমার হৃদয়ের একটী গূঢ় কথা জানাইব। আমি আর চাপিয়া রাখিতে পারি না। উমা! তোমাকে যে দিন দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে জগৎসংসার ভুলিয়াছি। বেশী কথা বলিতে চাহি না। শুধু এইমাত্র বলিতেছি,—আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছি। বল উমা! তুমি কি আমাকে ভাল বাস? আমার ভালবাসার প্রতিদান পাইবার আশা করিতে পারি কি?" উমার মুখ লাল হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ নীরবের পর বলিল, "আপনি একি কথা বলিতেছেন? আপনার বিবাহের সমস্ত স্থির, আর আপনি কি অন্যায় কথা বলিতেছেন?" আমি বলিলাম, "উমা! তুমিত সব শুনিয়াছ, সে আপদ ত চুকে গেছে।"

উমা এবারে নতমুখ তুলিয়া ভ্রূকুটীপূর্ব্বক বিরক্তস্বরে বলিল, "আপনি এমনি স্বার্থপর! আহা! জলময়ের সময় তাহার কতই কষ্ট হইয়াছিল। আপনি সে জন্য কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন কিনা,"—আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "উমা! প্রকৃত বলিতেছি, উহা আমার মনের কথা নয়। সত্য সে হতভাগিনীর পরিণাম ভাবিয়া মনে কষ্ট হয়, কিন্তু আমি কি করিব? সে অদায় লইয়া জগতে আসিয়াছিল, তাহার জন্য আমি দোষী হইতে পারি না। যাক্ ও কথা। এখন আমার কথার উত্তর দাও। তোমারি ঐ কথায় উপর আমার ভবিষ্যৎ সুখ, আশা, ভরসা, সমস্তই নির্ভর করিতেছে। বল—একবার বল ভাল বাস কিনা?"

'বাসি' বলিয়া, উমা দ্রুত প্রস্থান করিল। তাহার সেই ক্ষুদ্র 'বাসি' শব্দটীর ভিতর কত মধুরতা অনুভব করিলাম, তাহা অন্যকে বুঝাইবার সাধ্য নাই।

পর দিবস অপরাহ্ণ সময়ে আমি একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছি, ইতিমধ্যে বৌদিদি ঠাকুরাণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন; "ঠাকুরপো! একটা ভাল খবর এনেছি, কি বক্শিশ্ দেবে বল দেখি?" আমি বলিলাম, "কি খবর বৌদি?" বৌদিদি বলিলেন, "আগে বল কি দেবে?"

আমি। আগে খবরটাই শুনি।

বৌদি। যদি ফাঁকি দাও?

আমি হাসিয়া বলিলাম, তবে "আমি নাচার।"

বৌদি। তবে তুমি শুন্‌বেনা?

আমি। আপনি না বলিলে কেমন করিয়া শুনিব?

বৌদি। তবে আমার একটী গল্প শোন।

আমি। এখন কি গল্প শুন্‌বার সময় বৌদি?

বৌদিদি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "কি কাজে ব্যস্ত আছ যে শুনবার সময় নাই?" বৌদিদি পাছে অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে বলিলাম "শুনব বৈকি বৌদি!" বৌদিদি তখন মিষ্ট হাসিয়া, গল্প আরম্ভ করিলেন, "গোপালপুর নিবাসী অমিয় কৃষ্ণ বসুর সহিত শ্রীপুর নিবাসী যোগেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দাসীর শুভ পরিণয়ের কথাবার্ত্তা এক প্রকার স্থির হয়। পাত্র অমিয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া, কলেজে পড়াশুনা করিত। গ্রীষ্মের ছুটীতে কলেজ বন্ধ হইলে, অমিয়কৃষ্ণের পিতা, অমিয়কে বিবাহের জন্য বাটী আসিতে পত্র লেখেন। অমিয় পত্র পাইয়া, যথা সময়ে নৌকাযোগে বাটী আসিতেছিল। পথিমধ্যে ভয়ানক দুর্য্যোগ—প্রবল ঝটিকাঘাতে অমিয়কৃষ্ণের নৌকা মগ্নপ্রায় হয়, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় অমিয়কৃষ্ণের কোন বিপদ হয় নাই।" আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "এ আবার কি গল্প বৌদিদি?"

বৌদিদি বলিলেন, "যা বলি শুন বাধা দিওনা। এমনি দুর্য্যোগের মধ্যে অমিয় দেখিল, তাহার নৌকার অতি নিকটেই একখানি আরোহী-পূর্ণ-নৌকা ডুবিয়া গেল। অমিয় প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, নদীবক্ষে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক অনেক কষ্টে একটী বালিকাকে উদ্ধার করিল। সেই বালিকার নাম হেমলতা দাসী।"

আমি পুনরায় বাধা দিয়া বলিলাম, "আপনার গল্প ভুল হইতেছে। তাহার নাম হেমলতা নয়, উমা।" বৌদিদি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আমার গল্প আমি জানিনা, আর তুমি জান? কি বলিতে ছিলাম হাঁ—সেই জলমগ্ন বালিকার নাম হেমলতা। হেমলতার মাতামহীর মরণাপন্ন পীড়া হওয়ায়, তাঁহার একমাত্র কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রীকে দেখিতে শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হেমলতার পিতা যোগেশ বাবু যথা সময়ে স্ত্রী, কন্যা সমভিব্যাহারে, শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হন, এবং শ্বশ্রূর মৃত্যুর পর বাটী ফিরিবার পথে প্রবল ঝটিকাঘাতে তাঁহার নৌকা জলমগ্ন হয়। যোগেশ বাবু পত্নীর সহিত কোন প্রকারে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু প্রিয়তমা কন্যার কোনই সন্ধান না পাইয়া, নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া রহিলেন।

এদিকে অমিয় যে বালিকাকে উদ্ধার করিল, সেই যোগেশবাবুর একমাত্র দুহিতা হেমলতাই অমিয় কৃষ্ণের ভাবী পত্নী।" আমি তখন নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া বলিলাম, "বৌদি শীঘ্র গল্পটী শেষ করুন।" বৌদিদি একটু মুচ্‌কিয়া হাসিয়া, আরম্ভ করিলেন—, "অমিয় অতি যত্নে হেমলতাকে বাটী লইয়া আসিল, কিন্তু অমিয় কিম্বা অমিয়র পিতামাতা কেহই হেমলতার প্রকৃত পরিচয় পাইলেন না। তাহার কারণ সেই অল্পবুদ্ধি বালিকা হেমলতা অমিয় ও বাটীর অন্যান্য সকলের নিকট উমা নামে পরিচিতা হইয়াছিল। তাহার পিতামাতার প্রসঙ্গ উত্থাপন হইলেই

সে এতদূর ব্যাকুল হইত যে, কেহই সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অমিয়কৃষ্ণের গৃহে মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিল, কিন্তু ভ্রমেও জানিল না যে, এই তাহার ভাবী শ্বশুরালয়।

উভয় পক্ষে বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছিল বটে, কিন্তু হেমলতাকে পাত্রের বাটীর কেহ কখন দেখে নাই, কাজেই তাহাকে কেহ চিনিল না। যোগেশ বাবু যখন কন্যার কোনই সন্ধান পাইলেন না, তখন পাত্রের পিতাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। তখন অমিয়কৃষ্ণের বাটীর সকলেই উমাকে হেমলতা বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন, উমা নামে যোগেশবাবুর কোন কন্যা নাই। হেমলতাই তাঁহার একমাত্র সন্তান। আর উমা যদি যোগেশ বাবুর কন্যা না হয়, একে তিনি কন্যাহারা হইয়া মনের কষ্টে আছেন, তাহার উপর আবার যদি আশায় নিরাশ হন, তাহা হইলে বড়ই মর্ম্মাহত হইবেন, এই ভয়ে তাঁহাকে সেই বালিকার প্রাপ্তি সংবাদ কেহই দিল না। ক্রমে ক্রমে অমিয় হেমলতাকে ভাল বাসিল।

চতুর অমিয় ভাবিত তাহার এই গুপ্ত প্রণয়ের কথা কেহ জানে না। কিন্তু তাহার একজন শুভাকাঙ্ক্ষিণী আত্মীয়ার নিকট কিছুই আগোচর ছিলনা। সেই আত্মীয়া, দুটী হৃদয় একত্র করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং সে সর্ব্বদা উমাকে হেমলতা বলিয়া সন্দেহ করিত। এক দিবস অনেক মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা করিয়া, উমা ওরফে হেমলতার নিকট প্রকৃত পরিচয় পাইল। তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না। বাটীর সকলে এ শুভ সংবাদে বিশেষ আনন্দিত হইলেন। যোগেশবাবুকে তাঁহার হারানিধি কন্যার সংবাদ পাঠান হইল। সকলেই আনন্দসাগরে ভাসিলেন, কেবল সেই হতাশ-প্রেমিক অমিয়কৃষ্ণ এ বিষয়ের বিন্দুমাত্রও জানে না। তাই তাহার শুভাকাঙ্ক্ষিণী বৌদিদি শুভসংবাদ দিতে উপস্থিত—" এই বলিয়া, বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "কেমন ঠাকুর পো! গল্পটা ভাল কি না? এখন কি বখশিশ্ দেবে?" আমি বলিলাম, "কি দিব বৌদি! আমার কি আছে?" বৌদিদি বলিলেন, "তা জানি, তোমরা ফাঁকি দিতে পারলে আর কিছু চাওনা। তা যাক্, আমিই তোমায় কিছু পুরস্কৃত করিতেছি।" বলিয়া, বৌদিদি কক্ষের বাহিরে আসিয়া, উমার হস্ত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া আমার হস্তের উপর তাহার হস্ত দিয়া বলিলেন, "এই নাও ঠাকুর পো! আমাদের হারানিধি হেমলতাকে তোমার করে সমর্পণ করিলাম। স্নেহে, যত্নে তোমার উমাকে চিরদিন আদরে রাখিও—"বলিয়া বৌদি প্রস্থান করিলেন। উমাও সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিল। পাঠক পাঠিকাগণ! বৌদির গল্প হইতে

সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়াছেন পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

যোগেশ বাবু যথা সময়ে তাঁহার কন্যাকে লইয়া গেলেন। এবং অল্প দিবস পরেই আমি মহাধূমধামের সহিত হেমলতার পাণিগ্রহণ করিলাম। আজ ফুলশয্যা রাত্রি! জ্যোৎস্নাময়ী চাঁদের ধবল-কিরণ গবাক্ষ দিয়া হেমলতার বদনে পড়িয়াছে, নানাবিধ ফুল অলঙ্কারে তাহাকে যেন ফুল-রাণী দেখাইতেছে। সুগন্ধি তৈলচর্চ্চিত চিকণচিকুরের উপর আবার আতর গোলাপ মাখিয়াছে, ফুলের সৌরভ, আতরের গন্ধ আর হেমলতার সেই অনিন্দ্য-সুন্দর সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত চারুমুখ, আমাকে যেন উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া, দুই হস্তে হেমলতার নত-মুখ খানি তুলিয়া ধরিয়া ডাকিলাম, "হেম-লতা!" হেমলতা একটু হাসিয়া বলিল, "হেমলতা কোথায়? সে ত জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, তোমার আপদ গিয়াছে। আমি উমা।" আমার পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল, বুঝিলাম হেমলতা সেই কথার প্রতিশোধ লইতেছে। আমি বলিলাম, "সে কাহার জন্য বলিয়া ছিলাম? বেইমান! এখন ও কথা বলিবেই তো।"

হেমলতা আবার হাসিয়া বলিল, "তুমি আমাকে হেমলতা না বলিয়া উমা বলিয়া ডাকিও। তোমার মুখে উমা নাম শুনিতে ভালবাসি।"

আমি বলিলাম, "তাহাই হইবে, কিন্তু তুমি উমা নামে কেন পরিচিতা হইয়া অনর্থক কষ্ট পাইলে?" "উমা আমার আর একটী নাম, কিন্তু ও নাম আমার প্রচলিত নয়, কেন জানিনা ঐ নামে তখন পরিচিতা হইয়া ছিলাম।" বলিয়া হেম-লতা আবার বিশ্বমোহিনী হাসি হাসিল।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

বিধবা-বিবাহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১। পুনর্ব্বিবাহ—ব্রহ্মচর্য্যে অশক্তা বিধবা রমণীর অধিকার বিচারপূর্ব্বক হিন্দুশাস্ত্রকার আদেশ করিয়াছেন, পুন-র্ব্বিবাহ। কলিযুগধর্ম্মপ্রণেতা মহর্ষি পরা-শর বলেন,

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধী-য়তে॥

ভগবান্ মনু বলেন,

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥

টীকায় কুল্লুক ভট্ট লিখিতেছেন,

পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা মৃতপতিকা যে স্ত্রী, সংস্কার দ্বারা পুনর্ব্বার অন্যের ভার্য্যা হইয়া উহার দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে, ঐ পুত্র ঐ উৎপাদকের পৌনর্ভব

নামক পুত্র হইবে।

এইরূপে ব্রহ্মচর্য্যে অনধিকারিণী বিধবা-দিগের জন্য শাস্ত্রকারগণ পুনর্ব্বিবাহে বিধি প্রদান করিয়াছেন।

মহাপ্রাণ শাক্যসিংহ রাজসম্পদ পদ-দলিত করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, তাই তিনি সর্ব্বজন-নমস্ত; কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল রাজা বা রাজকুমার শাক্যসিংহের পথাবলম্বন করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু রাজোচিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করিলে কি বাতুলের কার্য্য হয় না? সেইরূপ ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণ ভক্তির পাত্রী ও প্রশংসনীয়া বলিয়া ধর্ম্মপরায়ণা, পতি-পরায়ণা, বিবাহিতা বিধবাগণকে নিন্দার বা ঘৃণার চক্ষে দেখিলে, তাহাও কি বাতুলের কার্য্য হয় না? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, অনুদার হৃদয় লইয়া আমরা যে রকম বিচার করি না কেন, সেই সর্ব্ব ভূতের কল্যাণপ্রার্থী, তপঃসিদ্ধ আর্য্য ব্রাহ্মণেরা কখনই বিবাহিতা বিধবাকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করেন নাই, তাহা পরাশর-বাক্যে এবং "সংস্কার দ্বারা অন্যের ভার্য্যা হইয়া" ইত্যাদি ভাষ্যে প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমরা জানি ব্রহ্মচর্য্যই বৈধব্যাবস্থায় শ্রেষ্ঠতর ব্রত। তথাপি যে আর্য্যঋষিগণ বিধবা বিবাহের বিধি কেন প্রদান করি-লেন, সে কথা বর্ত্তমান সমাজের প্রতি মনোনিবেশ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিব।

বিগত সেন্সসে হিন্দু বিধবাদিগের বয়সের যে তালিকা প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে; সে তালিকা এইরূপ,—

১ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বিধবা——৫১৫
২— — — — — — — —৫৭৪
৩— — — — — — — —৬৫১
৪— — — — — — — —৫৭৬
৫— — — — — — — ৩৮৬১

৬ হইতে ১০।১২ বৎসর বয়স্কা বিধবার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি!!

ইহার মধ্যে আবার,

ব্রাহ্মণবিধবা

৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত	১২৮
৫ হইতে ১২ „	১৭০৮

কায়স্থবিধবা

৫ বৎসর পর্য্যন্ত	৯৫
৫ হইতে ১২ „	৬৭৯

হিন্দু শাস্ত্রে অষ্টম হইতে দশম বর্ষীয়া কুমারী কন্যা বিবাহের বিধি আছে; আবার শাস্ত্রকারগণের অনুশাসন,

"অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্ম-
শাসনাম্॥"

কিন্তু শাস্ত্রার্থীরা দুগ্ধপোষ্যা শিশুকন্যার বিবাহ ঘটাইয়া তাহাকে বিধবা সাজাইতেছেন! সমাজ তাহাকে ব্রহ্মচা-রিণী করিতে চাহিতেছেন বটে, কিন্তু ঐশী শক্তির নিকটে মানবীশক্তি যে ধূলিকণা মাত্র, স্বাভাবিকতার নিকটে সামাজিক শাসন যে, নগণ্যমাত্র, ইহা স্থিতিশীল মহা-শয়েরা কেন বুঝিতেছেন না? এই কি

শাস্ত্রবিধির গৌরবরক্ষা ? এই কি আর্য্য সন্তানগণের হৃদয় ? এই কি, সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা ?

এখন আমাদের বিনীত নিবেদন, যিনি আর্য্যঋষিগোত্রজাত, যিনি হিন্দু, যিনি সমাজের হিতৈষী, তিনি সেই আর্য্য ঋষি-গণের পদানুসরণ করিয়া, পরকে আপন করিয়া, ভেদ বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দু বিধবা-দিগের অধিকার বিচার করুন। যাহারা শিশু বিধবা, যাহারা বালিকা বিধবা, দাম্পত্য সম্বন্ধ বা পতিপ্রেম-জ্ঞানপরিশূন্যা, যাহারা বিবাহিত জীবনে সপত্নীযন্ত্রণাগ্রস্তা, যাহারা দুশ্চরিত্র পাষণ্ড স্বামীর পাশবা-চরণে জীবন্মৃতা, যে বালিকাকে প্রায় প্রপিতামহ-তুল্য অশীতিপর বৃদ্ধের ভার্য্যা হইয়া দুই দশ দিন গৃহধর্ম্ম রক্ষার অভিনয় করিতে হইয়াছে, এই সকল অবস্থায় পতিতা রমণীগণের যদি (অতি তরুণ বয়সে নিঃসন্তানাবস্থায়) বৈধব্য দশা ঘটে, তাহা হইলে তুমি আমি, যাহাই বিচার করি না কেন, আজি সেই বিরাট পুরুষ আর্য্যঋষিগণ, এ দেশে বর্ত্তমান থাকিলে, মুক্তকণ্ঠে আদেশ করিতেন, "ইহারা ব্রহ্ম-চর্য্যে অনধিকারিণী বলিয়া, ইহাদিগের পুনর্ব্বিবাহই আমাদিগের ব্যবস্থা।"

সমাজ-শাসন ভয়ে, উপায়ান্তর অভাবে, অনিচ্ছাকৃত ব্রহ্মচর্য্যে যে, কতদূর বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, আমাদের সমাজে তাহা বোঝেনও অনেকে, জানেনও অনেকে। দেশে কত ভ্রূণহত্যা হইতেছে, কত হতভাগিনীকে কুপথ অবলম্বন করিতে হইতেছে, কত বিধবাকে গোপনে হত্যা করা হইতেছে, কত বিধবা আত্মহত্যা করিতেছে, এ সকল কথা পর্য্যালোচনা করিলে, কাহার মন চমকিত না হয় ? কাহার হৃদয় আকুল না হয় ? তথাপি আমাদের যে কি কুবুদ্ধি বিধবা-বিবাহের পথ রুদ্ধ করিয়া, আমাদের ধর্ম্ম-লোপ, গৃহে অশান্তি, বংশ ক্ষয় * প্রভৃতি মহা অকল্যাণপূর্ণ ঘটনা ঘটিতেছে, তথাপি আমরা বিধবা-বিবাহের পথ মুক্ত করিতে সাহসী হই না ! আমরা কাল্পনিক আশ-ঙ্কায়—পাছে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে সমাজে কোন বিপ্লব ঘটে, পাছে আমাদের স্বার্থে কোন আঘাত লাগে, এই সব কল্পিত ভয়ে আমরাই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছি !

এমন করিয়া আর কত দিন কাটিবে ভাই ? এহেন জাতীয় কলঙ্ক আর কত দিন পুষিবে ভাই ? ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মা-চরণ আর কত দিন চলিবে ভাই ? আর কেন ?—এখন মানুষের মত, আর্য্য-ঋষি-

---

* বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাস হইতেছে দেখিয়া অনেকে ভীত হইতেছেন। কিন্তু বিবেচনা করিতেছেন না যে, প্রধানতঃ সে হ্রাসতার মূল আমরা। আপনারাই "খাত সলিলে" ডুবিয়া মরিতেছি। সেন্‌সসের তালিকা দেখিয়া শিশু বিধবা ও বালিকা-বিধবাদিগের সংখ্যা স্থির করিলে, হিন্দুজাতির হ্রাসতার প্রধান কারণ, বিধবা-বিবাহ না দেওয়া, ইহা সকলে বুঝিতে পারেন ?

প্রঃ লেঃ।

গণের সন্তানের মত, নবজীবনে জীবিতের মত, ক্ষুদ্র স্বার্থের বন্ধন, কাল্পনিক ভয়ের পুরাতন গ্রন্থি ছিঁড়িয়া, বিধবা-বিবাহের পথ মুক্ত কর। এ কাজ একের সাধ্য নহে, অনেকের; অনেকের শুধু নহে, সকলের। সকলে এক মত হইয়া সকলের সমাজকে রক্ষা কর। সমাজের লোকক্ষয়, সমাজের পাপ, সমাজের কলঙ্ক—স্থিতিশীল হও, আর উন্নতিশীল হও, তোমরা দেখিবে নয় তো আর কে দেখিবে?

সমাজে যাঁহারা বিধবা-বিবাহের বিরোধী, তাঁহারা অনেকে অনেক রকম আপত্তি করিয়া বিধবা-বিবাহ অপ্রচলিত রাখিতে চেষ্টা করেন। আমাদের যতদূর সাধ্য সেই আপত্তি গুলি অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি এবং জ্ঞান ও বিশ্বাস মত তদ্বিষয়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না?

২। পুরাকালে প্রচুর পরিমাণে বিধবা-বিবাহের প্রমাণ পাওয়া যায় না কেন?

৩। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে, সন্তানবতী এবং বর্ষীয়সী বিধবাগণ বিবাহ করিতে অগ্রবর্ত্তিনী হইবেন, তাহাতে সমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটিবে।

৪। বিধবা বালাগণ বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না কেন?

৫। বিধবা-বিবাহে দম্পতী প্রকৃত সুখী হয় কি না এবং বিবাহিতা বিধবা, কুমারী ভার্য্যাদিগের ন্যায় পতিব্রতা হইবে কি না?

৬। বিধবা-বিবাহে কুমারীদিগের বিবাহে বাধা হইবে কি না?

এই সকল আপত্তির আমরা যথাসাধ্য মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সত্য জয়যুক্ত হউন।

১। স্থিতিশীল দলের প্রধান আপত্তি বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না? বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্রসিদ্ধ, তাহা আমরা যথাসাধ্য বলিয়াছি। কিন্তু আমাদের এই নগণ্য প্রবন্ধ পড়িয়া তদ্বিষয় কাহারও শিখিতে হইবেনা। কেননা—যিনি আমাদের জাতীয় গৌরব, আমাদের সেই বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিধ শাস্ত্রের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া যে "বিধবা-বিবাহ" বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক প্রচার করেন, বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত তদ্বিষয়ক বিচারে তিনিই জয়লাভ করেন; অনেক পণ্ডিতই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচারিত শাস্ত্রবিধি একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং দেশের অনেক রাজা, জমিদার সুলেখক, চিন্তাশীল, উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া, সকলে একযোগে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। এতাদৃশ জলন্ত প্রমাণ থাকিতে নগণ্য ব্যক্তি আমরা, এই নগণ্য প্রবন্ধে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রসিদ্ধতার বিষয় আবার কি প্রতিপন্ন করিব? যাঁহাদের আবশ্যক হইবে, তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে সমস্ত আবশ্যকীয় উত্তর পাইবেন। তবে যাঁহারা শাস্ত্রদর্শী, তাঁহাদের কাছে

আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে, যে সকল ব্যক্তি নিজে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন নহেন, তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিবার জন্য বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া নিজেদের সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। নিজের মত অপ্রতিহত রাখা অপেক্ষা, সত্যরক্ষা মানবের প্রধান কর্ত্তব্য।

২। আপত্তি—পুরাকালে প্রচুর পরিমাণে বিধবা-বিবাহের প্রমাণ পাওয়া যায় না কেন? এ কথার উত্তরে বলিতে হইতেছে, প্রধানতঃ চারিটী কারণে পুরাকালে বিধবা-বিবাহ বহুল পরিমাণে আবশ্যক হয় নাই। প্রথমতঃ পুরাকালে অকালমৃত্যুর এতটা প্রাদুর্ভাব ছিল না। রোগাদি-জনিত অকালমৃত্যু কচিৎ হইত। সুতরাং অকালবিধবার সংখ্যাও অতি অল্প ছিল। দ্বিতীয়তঃ তখন শৈশব বিবাহ ছিল না। সমাজে বহু অনুসন্ধান করিলে বাল্য-বিবাহ কদাচিৎ দেখা যাইত; সুতরাং পুনর্ব্বিবাহে যাহাদের বিশেষ প্রয়োজন, সেই শিশু বিধবা বা বালিকা-বিধবা মিলিত না, সুতরাং প্রচুর পরিমাণে বিবাহিতা বিধবা মিলিবে কি করিয়া? তৃতীয়তঃ তখন সহমরণ প্রথা ছিল; যখন যুদ্ধ বিগ্রহে যে সকল যোদ্ধাগণ মৃত হইতেন, তাঁহাদের পত্নীগণ প্রায়ই তাঁহাদিগের সহগামিনী হইতে পারিতেন। চতুর্থতঃ তখন নিয়োগপ্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল; রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের বংশ-লোপ-সম্ভাবনা হইলে সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাদিগকে নিয়োগধর্ম্মে নিযুক্তা করা হইত। মহর্ষি দীর্ঘতমা কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় বংশরক্ষা, ব্যাসদেব কর্ত্তৃক কুরুবংশ রক্ষা, পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম বিবরণ ইত্যাদি ঘটনা হইতে নিয়োগধর্ম্মের যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রতিষেধক ঘটনার মধ্যেও আমরা চারিজন বিধবা মহিলার পুনর্ব্বিবাহের কথা জানিতে পারি। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমা মদনপত্নী মায়াবতী, দ্বিতীয়া বালীপত্নী তারা, তৃতীয়া রাবণ-পত্নী মন্দোদরী, চতুর্থী নাগকন্যা উলুপী। এই মহিলাগণ মধ্যে তারা ও মন্দোদরী অসাধারণ রমণী। যাঁহারা রামায়ণাদিতে ইঁহাদিগের চরিত্রে মনঃসংযোগ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য বুঝিয়াছেন যে তারা ও মন্দোদরী উভয়েই ধর্ম্ম-পরায়ণা, পতি-ভক্তিমতী, বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী, সাম্রাজ্ঞী পদের উপযুক্তা গুণ-বিশিষ্টা ছিলেন। ইঁহারা দ্বিতীয় বার বিবাহিতা বলিয়া অবজ্ঞা করা দূরে থাকুক, গুণগ্রাহী আর্য্য-ঋষিগণ গুণগৌরবে ইঁহাদিগকে নারীকুলের শীর্ষস্থানীয়া করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে ভগবৎ-পদে দৃঢ় ভক্তি পূর্ব্বক সংযতি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া পতিমাত্র ভজনাই রমণীর সতীত্ব। বিবাহ একবার বা দুইবার হইলে আত্মার অপকর্ষ সাধিত হয় না। এই জন্য নিজের অনিচ্ছায়, কুশিষ্য কর্ত্তৃক বিপথগামিনী হইয়াও অহল্যা দেবী সতী; পঞ্চপতিকা হইয়াও দ্রৌপদী দেবী সতী; স্বামী কর্ত্তৃক নিয়োগধর্ম্মে নিযুক্তা হইয়া কুন্তী দেবী

সতী; ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের বিধানানুসারে বৈধব্যাবস্থায় পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া তারা ও মন্দোদরী সতী*। তাই উদারচেতা হিন্দুগণ ভক্তি-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে পবিত্র ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্মরণ করিতেছেন ;—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥"

অতএব ভারতবর্ষে বিধবা-বিবাহ অপ্রচুর হইলেও কদাপি অবজ্ঞেয় নহে।

৩। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে বর্ষীয়সী ও সন্তানবতী বিধবাগণ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন কি না, একথার উত্তরে আমরা বলি, সকল সমাজেই পুরুষ-জাতির বিবাহের পথ মুক্ত; বিপত্নীক অবস্থা দূরে যাউক, কত হিন্দু পুরুষ অদ্যাপি বহুবিবাহ করিতেও বিমুখ নহেন। অথচ হিন্দুসমাজে দেখা যায় স্ত্রী লোকান্তরিতা হইলে, সেই পরলোকগতা স্ত্রীর প্রণয়ানুরোধে অথবা সন্তান-সন্ততিদিগের অশান্তিভয়ে অনেক বিপত্নীক পুরুষ দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করেন নাই। যখন পুরুষদিগের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগস্বীকারের এতটা পরিচয় পাওয়া যায়, তখন মাতৃজাতির নিকটে লোকে অধিকতর ভরসা করিবে না কেন?

এদেশে মুসলমান সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু তথাপি অনেক বিধবা মুসলমানমহিলা মৃত-স্বামীর প্রেমানুরোধে, সন্তানদিগের অশান্তিভয়ে এবং সাংসারিক অসুবিধা-সম্ভাবনায় পত্যন্তর গ্রহণ করেন নাই। একবার রেলওয়ের গাড়ীতে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান-মহিলার সহিত একজন হিন্দু মহিলার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মুসলমান-মহিলার বয়স বিংশতি বর্ষের ঊর্দ্ধ নহে, সঙ্গে দুইটী শিশু পুত্র; প্রায় একবর্ষাধিক কাল তিনি বিধবা হইয়াছেন। কথায় কথায় হিন্দু-মহিলা তাঁহাকে পুনরায় পতি গ্রহণ করিবেন কি না, তদ্বিষয় প্রশ্ন করেন। মুসলমান-মহিলা সাশ্রুনেত্রে উত্তর করিলেন, "ভগিনি! আমার স্বামী যে মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে মনে পড়িলে আর কোনও পুরুষকে স্বামী বলিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ এই শিশু দুইটী তাঁহার প্রাণের অধিক ছিল; আমি যদি বিবাহ করি, তবে সে স্বামী আমার বাছাদিগকে সে রকম স্নেহ, মমতা করিতে পারিবেন কি? এই সব ভাবিয়া মনকে ঠিক্ করিয়াছি, আবার 'নিকা' করা অপেক্ষা আমার এই বৈধব্যদশা শতগুণে শ্রেয়ঃ। আমি চিরজীবন আমার স্বামীকে মনে করিয়া যেন দিন কটাইতে পারি, সেই আশীর্ব্বাদ করিবেন।" মুসলমান-মহিলার

* ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের ইচ্ছা ও আদেশে তারা ও মন্দোদরীর পত্যন্তর ঘটিয়াছিল। যদি ইহা কিছুমাত্র অধর্ম্মকর হইত, তবে ইহা মহাত্মা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক কদাপি অনুমোদিত হইত না। আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ধার্ম্মিকবর অর্জ্জুনের উলুপীকে বিবাহ, ইহা যদি কোন অংশে নিন্দিত প্রথা হইত, তবে বিশুদ্ধচেতা আত্মজয়ী, উর্ব্বশী প্রত্যাখ্যানকারী অর্জ্জুনের দ্বারা কদাপি তাহা সম্ভব হইত না।

(প্রঃ লেঃ)

কথা শুনিয়া হিন্দু-মহিলা পুলকিতচিত্তে বলিলেন, "আপনার মহত্বকে ধন্যবাদ! কেননা আপনাদের পত্যন্তর গ্রহণের পথ মুক্ত, তাই আপনাদের ত্যাগস্বীকারে, আপনাদের আত্মসংযমে, আপনাদের বৈধব্যব্রতাচরণে যে গৌরব আছে, হিন্দু-বিধবার তাহার শতাংশের একাংশও নাই। পথ খোলা থাকিলে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য করিতে প্রবৃত্তা হইতেন, তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে পারিতাম; কিন্তু সে পথ যখন একেবারে রুদ্ধ, তখন কে দেবী, কে মানবী, চিনিব কি করিয়া?" হিন্দু-মহিলার এই কথা সত্য কি না সমাজ-হিতৈষিগণ নিজেই বিচার করুন। যাহা হউক, এই মুসলমান-মহিলার মত হিন্দু-মহিলাগণও যে,মৃতপতির প্রেমময়ী ভার্য্যা ও ত্যাগস্বীকারপরায়ণা হইবেন না, স্ত্রী-জাতি এত অবিশ্বাসিনী হইল কিসে?

(ক্রমশঃ)

তুষারে বঙ্গমহিলা।

দেশ ভ্রমণ দ্বারা হৃদয়ের প্রকৃত শিক্ষা-লাভ হইয়া থাকে। দেশভ্রমণ হৃদয় প্রশস্ত করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ভারতভূমি লীলাময়ী প্রকৃতিদেবীর সাধের ক্রীড়া-কানন। বিদেশ হইতে ভ্রমণকারিগণ ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক ইহার প্রাকৃতিক শ্যামল লাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া যান। প্রত্যেক ভারতসন্তানকে অনুরোধ করি, প্রকৃতি সতী ভারতমাতার বরাঙ্গ কি অনন্ত বিচিত্র ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন, তাহা একবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। ভারতমাতার বিশালবক্ষে লুক্কায়িত দেশগুলি পরিভ্রমণ করিলে স্বদেশ-প্রেম উথলিয়া উঠিবে। আমি একটী গৃহপিঞ্জরাবদ্ধা বঙ্গমহিলা। জীবনে ভগবানের যে সকল কৃপা উপভোগ করিয়াছি, বঙ্গদেশ ভ্রমণের সুযোগ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলিয়া গণনা করি। সদাশয় স্বামী মহাশয় ও অন্যান্য আত্মীয়গণের সাহায্যে শারীরিক অনেক ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া ভারতমাতার মুখচ্ছবি নানা স্থানে নানা ভাবে অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। পাঠক! এই ভীষণ গ্রীষ্ম-পীড়িত কলিকাতায় বাস করিয়া তোমরা কি কল্পনা করিতে পার যে, ভারতমাতার বিশালবক্ষে বিস্তৃত পিণ্ডার তুষারক্ষেত্র বিরাজ করিতেছে। জীবনে এ স্থান দর্শন-রূপ সৌভাগ্য ঘটিবে কল্পনা করি নাই।

হঠাৎ এক দিন স্বামী মহাশয় সহাস্যমুখে বলিলেন, "কুমাউন রাজ্যের অন্তর্গত পিণ্ডার তুষারক্ষেত্রে কাল যাত্রা করিব। এই অল্প সময়, ইতিমধ্যে যাহা পার, যাত্রার উপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লও।" আমি তাঁহার মুখে এ কথা শুনিয়া আকাশের চাঁদখানি যেন হাতে পাইলাম। মন

আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। গৃহপিঞ্জর কতক্ষণে ছাড়িব, মন কেবল সেই প্রতীক্ষায় চঞ্চল। গৃহে অপোগণ্ড শিশুগুলিকে মাতার স্নেহ আবরণের অন্তরালে নিক্ষেপ করিয়া, পরদিন তুষারযাত্রীরূপে গ্রীষ্ম-তাপিত ধূলাজর্জ্জরিত কলিকাতা পশ্চাতে ফেলিয়া হাওড়ায় ট্রেণে উঠিলাম। সময়ের অল্পতাবশতঃ তুষারদেশে যাত্রার উপযোগী বস্ত্রাদি কিছুই সংগৃহীত হয় নাই। কয়েকখানা নোটবুক ও লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতে ভুলি নাই, শিশুদের অসহায় অবস্থা স্মরণপূর্ব্বক নয়নে অশ্রু বহিল, অসহায়ের অবলম্বন ভগবানের হস্তে সকল ভার অর্পণপূর্ব্বক প্রার্থনা-বিগলিতচিত্তে মনের বোঝা লঘু করিতে চেষ্টা করিলাম। হৃদয়ে শত সহস্র নূতন ভাবের লহরী খেলিতে লাগিল। বেঞ্চের এক কোণে বসিয়া প্রকৃতি সতীর নীরব উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিতে করিতে আপনা ভুলিয়া গেলাম। নিদ্রা দেবীর সাক্ষাৎ একটীবার ঘটিল না। পিঞ্জরাবদ্ধ বঙ্গবালার ভাগ্যে তুষারযাত্রার সৌভাগ্য যে অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটিল, তন্ময়চিত্তে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

পরদিন মধ্যাহ্নকালে কাশী পঁহুছিতে পঁহুছিতে গ্রীষ্মতাপে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। সহযাত্রী একজন ভদ্রলোকের বন্ধুব্যবহারে এই দুঃখের সময় বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম। যাত্রার দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে বেরেলী ষ্টেষণ হইতে "অযোধ্যা রোহিলখণ্ড" রেলপথে উঠিয়া কুমাউন রাজ্য ভেদ করিয়া তুষারযাত্রীরূপে কুমাউনের প্রধান নগর আলমোরা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই পথের গাড়ীগুলি অতি অল্পপরিসর ও কদর্য্য প্রণালীতে নির্ম্মিত। বর্ণভেদের তারতম্য সবিশেষ প্রবল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে লেখা "for European only." গভীর রাত্রিতে আমাদের মত নেটিভকে ১ম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া ইংরেজ-মহিলা ও তাহার সন্তানবর্গ একান্ত অসন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু স্বামী মহাশয়ের ভাব লক্ষ্য করিয়া নীরবভাবে আমাদের জন্য স্থান করিয়া দিল। কুমাউন রাজ্যের শ্যামল প্রশান্ত ছবি প্রভাতকালে হৃদয়কে অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ করিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী সকল সন্তোষের আলয় বলিয়া প্রতীয়মান হইল, পাহাড়ী স্ত্রী, পুরুষেরা আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যে ব্যস্ত। এই কুমাউন রাজ্য ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে মনে হইতে লাগিল যেন, চিরপরিত্যক্ত পিতৃদেশ পূর্ব্ববঙ্গ ভেদ করিয়া চলিতেছি। আমার হৃদয় ও দুর্ব্বল শরীর নূতন উৎসাহ ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ক্রমে পর্ব্বতরাজির উন্নত শিখর গহন ভেদ করিয়া নীল আকাশপথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে লক্ষিত হইল। আমরা পর্ব্বতের পাদমূলস্থ নানা মনোহর গ্রাম অতিক্রমপূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্ণ ১০ টার সময় কাঠগুদাম নামক ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। রেলওয়ের শেষ ষ্টেসন কাঠগুদাম। ইহার একটী ক্ষুদ্র গৃহ পূর্ব্বেই

ইংরাজ পরিবার কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া এই লোক গুলি যেরূপ অসভ্য ব্যবহারে সাহসী হইল, তাহা লিখিতে লজ্জা হয়। আমিও দমিবার পাত্র নহি। জল আনাইয়া স্নানাদি ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলাম। এইবার আমাদের পর্ব্বতারোহণ পর্ব্ব আরম্ভ করিতে হইবে বলিয়া স্বামী মহাশয় আমাকে উত্তমরূপে বল সঞ্চয় করিতে বার বার উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। আমাদের বন্ধু আল্মোরাবাসী যশী মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই আমার জন্য ডাঁণ্ডী ও স্বামী মহাশয়ের জন্য ঘোড়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাহারা দার্জ্জিলিং গিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট দাণ্ডির পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই ডাঁণ্ডা তদপেক্ষায় সঙ্কীর্ণ আয়তন। ইহার জীর্ণ মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট শুনিলাম,—পথে বাঘেরও উৎপাত হইয়াছে। আমি জলের কুজাটী ও কয় খানা নোট বুক লইয়া ডাঁণ্ডা আরোহণ করিলাম। তাহার পূর্ব্বে প্রাণের আশঙ্কায় বাহকদিগকে প্রচুর মিষ্টান্ন বিতরণে তুষ্ট করিলাম।

(ক্রমশঃ)

আর্য্যদিগের রন্ধনপাত্র ও ভোজনপাত্র।

রন্ধনগৃহ ও ভোজনগৃহ বিশুদ্ধ হওয়া যেমন আবশ্যক, তেমনি রন্ধনপাত্র সুনির্ব্বাচিত হইয়া উহার পবিত্রতা রক্ষা হয়, এ বিষয়েও আর্য্যশাস্ত্রে অনেক উপদেশ আছে। আর্য্যগণ মনে করিতেন না যে, যে সে পাত্রে রন্ধন করা হইলেই হইল, যেসে পাত্রে ভোজন করা হইলেই হইল। যে যে পাত্রে রন্ধন, রন্ধিত দ্রব্য রক্ষা ও ভোজন করা উচিত তাহা প্রাচীন আর্য্যগন পরীক্ষা দ্বারা সুপ্রমাণিত, প্রমাণদ্বারা সুনিশ্চিত, নিশ্চয়তা দ্বারা দৃঢ়ীকৃত বা সিদ্ধান্তীকৃত করিয়াছেন। যদি সেইগুলি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে অপ্রচলিত হইয়া থাকে, তবে পুনরায় সেই রীতিতে তৎসমুদায়কে সাধ্য মত চলিত করিবার চেষ্টা করা মন্দ নয়। যাঁহারা মনে করেন,—হিন্দু আচারের মূলে কোন সত্য নিহিত নাই, তাঁহারা ঐ সকল নিয়ম উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঐরূপ নিষ্ঠাবৰ্জ্জিত জঘন্যদিগের জন্য হিন্দু আচার নহে। অন্য দেশবাসী অহিন্দুগণ হিন্দু-আচারে অনভ্যস্ত, তাঁহাদের ভোজনপাত্র ও রন্ধনপাত্রাদি হিন্দুদিগের সহিত প্রায় মিলে না।

অনেক দেশে মৃত্তিকা নির্ম্মিত ভোজনপাত্র যতদিন পর্য্যন্ত নষ্ট না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত উহাতে ভোজন কার্য্য চলিতে কাহারও আপত্তি নাই। ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ মৃত্তিকানির্ম্মিত ভোজনপাত্রে অন্ন

অর্থাৎ খাদ্য বস্তু রাখিয়া একবার মাত্র ঐ পাত্রস্থ অন্ন ভোজন করেন, আবার পরক্ষণেই সেই মৃণ্ময় পাত্রটী অপবিত্র বোধে ত্যাগ করেন। উহাতে আর দ্বিতীয় বার সময়ান্তরে ভোজন করিতে পারেন না। সমস্ত প্রকার উচ্ছিষ্ট ধাতুপাত্রই কোন না কোন দ্রব্যবিশেষ দ্বারা মাজিয়া, বা প্রক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ করা যায়, কেবল মৃণ্ময়পাত্র শুদ্ধ করা যায় না। মৃণ্ময় রন্ধনপাত্রে একবারমাত্রই রন্ধন করা যায়, আবার পরক্ষণে উহা ত্যাগ করাই প্রধান কর্ত্তব্য।

নিত্যং নূতনভাণ্ডেন কর্ত্তব্যঃ পাকএবচ।
অথবা পক্ষপর্য্যন্তং তত্ত্যাজ্যোঃ মনীষিভিঃ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্)

অনুবাদ। প্রত্যহ নূতন ভাণ্ডে পাক করা উচিত। অথবা এক পক্ষ অর্থাৎ পনর দিন পর্য্যন্ত পাক করিয়া তাহা ত্যাগ করিবে।

পকপাত্রেণ যৎপক্কং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।
(মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্রম্।)

অনুবাদ। একবার যে পাত্রে পাক করা হইয়াছে, পুনরায় তাহাতে পাক করিলে সেই পাক করা খাদ্য নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ উহা দেবতাদিগের উদ্দেশে নিবেদন করা যায় না এবং নিজেরা ভক্ষণ করিলেও উহাতে স্বাস্থ্যহানি ও অপবিত্রতা জন্মিতে পারে।

হিন্দুসমাজে 'বিধবা ও ব্রহ্মচারীদিগের মধ্যে অদ্যাপি রন্ধনপাত্র সম্বন্ধে উল্লিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। হিন্দু বিধবাগণ পিত্তলনির্ম্মিত পাকপাত্রে পাক করিয়া তাহা না মাজাইয়া আর দ্বিতীয় দিনে বা দ্বিতীয়বারে তাহাতে রন্ধন করেন না। যদি কখন মৃণ্ময়পাত্রে রন্ধন করিতে হয়, তবে পাকান্তেই উহা ত্যাগ করেন, দ্বিতীয়বার আর উহাতে রন্ধন করেন না। মৃণ্ময়পাত্র যে সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে পনর দিন পর্য্যন্তও পাক করা যায় এরূপ বিধান আছে, উহা প্রকৃত পক্ষে প্রধান বিধি নহে। বস্তুতঃ প্রতিদিন মৃণ্ময়-পাকভাণ্ড পাকান্তে ত্যাগ করিবার বিধিই প্রকৃত বিধি। যাহা হউক, মাসান্তে বা পনর দিন পরে পাকের মেটে পাতিল ত্যাগ করিলেও চলে। কিন্তু হায়! এক্ষণে আমাদের হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্র ঐ নিয়ম কোথায় প্রতিপালিত হয়? যতদিন পর্য্যন্ত পাকের পাতিল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত অবাধিতরূপে উহাতে পাক-কার্য্য চলিয়া থাকে। কেবল অশৌচান্তদিনে এবং চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ কালে মৃণ্ময়পাকপাত্র বর্জ্জন করিবার বিধি আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—শুদ্ধি-প্রকরণে উচ্ছিষ্টাদি মৃণ্ময়পাত্র শোধনের কোন নিয়মবিশেষ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ইহা অনুভব বা প্রত্যক্ষ দ্বারাও জানা যায় যে উত্তমরূপে ধৌত করা হইলেও পাকের স্থালীতে পর্য্যুষিত অন্নাদির বীজ কিছু না কিছু লাগিয়া থাকে। পর্য্যুষিত অন্নের মধ্যে শরীরের স্বাস্থ্যনাশক ও বল-হানিজনক এরূপ পদার্থ বর্ত্তমান থাকে, যে, তাহা খাইলে মনুষ্য চিররোগী হইয়া

থাকে। যদি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কেহ মৃণ্ময় পাকপাত্র ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে—প্রত্যহ দুই বেলা দুই বার পাকপাত্র বর্জ্জন করা না হইলেও অন্ততঃ পনর দিন বা একমাস পরে উহা ত্যাগ করেন। প্রতিপদে কোন মৃণ্ময় পাত্রে রন্ধন করা আরম্ভ করিলে পূর্ণিমা বা অমাবস্যার দিন তাহা ত্যাগ করিলে পনর দিনের কথা বেশ মনে থাকে। অথবা রন্ধন পাত্র ব্যবহারের দিন মনে রাখিয়া পরেই গণনায় যে দিন পঞ্চদশ দিবস হয়, তৎপর দিন উহা ত্যাগ করিলেও হইতে পারে। মাসান্তে অবশ্য উহা ত্যাজ্য। হিন্দুগৃহস্থের অনেক প্রকারে অনেক ব্যয় হইতেছে, ঐ সমস্ত ব্যয়ের মধ্যে মৃণ্ময়পাকপাত্র মধ্যে মধ্যে বর্জ্জনে যে সামান্য ব্যয় হয়, তাহা স্বীকার করিয়া লইলে ভবিষ্যতে অনেক পীড়ার নিবারণ পক্ষে অনুকুল হইতে পারে। যাঁহারা পিত্তল-নির্ম্মিত পাকপাত্রে পাক করেন, তাঁহারা সাধ্য পক্ষে প্রত্যহ দুই বেলা উহা মাজাইয়া উহার পবিত্রতা রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করেন ইহা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। পিত্তলনির্ম্মিত পাকপাত্র ভিন্ন ধাতব পদার্থের মধ্যে লৌহের ও তামার পাকপাত্র যে রন্ধন বিষয়ে প্রশস্ত নহে, তৎপক্ষে শাস্ত্রে নিম্নলিখিতানুরূপ প্রমাণ বিদ্যমান আছে ;—

যদাতু আয়সে পাত্রে পক্কমন্নাতি বৈ দ্বিজঃ।
স পাপিষ্ঠোঽপি ভুক্ত্বান্নং রৌরবেং পরিপচ্যতে ॥

(মৎস্যসূক্তমহাতন্ত্রম্ ॥

অনুবাদ। যদি কোন দ্বিজ লৌহনির্ম্মিত পাত্রে পক্ক অন্ন ভোজন করে, সেই পাপিষ্ঠ সেই অন্নভক্ষণ জনিত পাপের ফলে মৃত্যুর পর রৌরব নামক নরকে পচিয়া কষ্ট পায়।

নেত্ররোগমনসোহানিস্তাম্রপক্কান্নভোজনাৎ।

(মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্রম্।)

অনুবাদ। তাম্রপাত্রে পাক করিয়া সেই অন্ন খাইলে চক্ষুর দোষ জন্মে এবং মানসিক বল নষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

ইউরোপ খণ্ডের কোন এক দেশে জনৈক মহিলা ধর্ম্মপ্রাণা বলিয়া বিশেষরূপ খ্যাতিলাভ করেন। এমন কি তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষমতা জন্মিয়াছে, এ কথাও অনেক লোক বিশ্বাস করিতে লাগিল। তাঁহার এই অসাধারণ গুণের জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে বহুতর লোক তাঁহার সন্নিধানে সমবেত হইতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার প্রতিপত্তির কথা পোপের কাণে উঠিল। পোপ সংবাদ পাইয়া একটু আশঙ্কিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে মহিলার প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিলে, তাঁহার প্রতি জনসাধারণের

শ্রদ্ধার কিছু হ্রাসতা জন্মিতে পারে, তাই সমস্ত সংবাদ জানিবার জন্য একজন কার্ডিনেলকে সেই মহিলা সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। কার্ডিনেল যাইয়া দেখিলেন যে লোক মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা অলীক নহে। বহুল লোকের সমাগম দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। তৎপরে জনতার মধ্য দিয়া রাস্তা কাটিয়া মহিলার সমীপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সকলে তাঁহাকে পোপ অপেক্ষা সম্মান করিতেছে। যাহা হউক, ধর্ম্মের ভিত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহার পা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—"মহাশয়া! আপনি ধর্ম্মে অলঙ্কৃতা হয়েছেন, অনেক লোক আপনার চরণ পূজা করিতেছে, এই দিন আমার পায়ের জুতার ফিতাটা খুলে দিন। বহুলোকের ভক্তি পাইয়া মহিলার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, ধীরে ধীরে, অহঙ্কার অভিমানে তাহার কোমল হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছিল, তাই কার্ডিনেলের ব্যবহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধা হইয়া হাত সরাইয়া লইলেন। কার্ডিনেলও আর বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যথাকালে পোপের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পিতঃ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কারণ যেখানে বিনয়ের অভাব সেখানে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।" এই বলিয়া তিনি কি উপায়ে মহিলার জীবন পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিলেন। পোপও তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কার্ডিনেল অতি অল্প কথায় ধর্ম্মের চরম কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। ধর্ম্ম বলিতে সাধারণ লোক কতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান মনে করিয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভের নাম ধর্ম্ম। জীব কি, জগৎ কি, জীবের সহিত জগতের কি সম্বন্ধ। জীব ও জগৎ স্বয়ম্ভূ কিংবা তাহাদের জনয়িতা কেহ আছে কি না, এই সকল বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান লাভের নাম ধর্ম্ম। আমি আজি অন্য বিষয়ের আলোচনা করিব না, কেবল জীব সম্বন্ধে যে লোকের একটা ভুল ধারণা রহিয়াছে তাহারই বিষয় একটু আলোচনা করিব। প্রায়ই সকল লোকই বিশ্বাস করেন যে, জীবের কর্ম্ম করিবার শক্তি জীবের স্বকীয় জিনিষ, তাহা হইতে উৎপত্তি এবং তাহাতেই পরিণতি। যখন মানুষ দেখিতে পায়, যে সে ইচ্ছামত একটা কর্ম্মে প্রবৃত্ত এবং একটা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে। তখন তাহার এ বিশ্বাসের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু প্রত্যেক মানুষ যদি একবার তাহার দৈনন্দিন জীবনের গতিবিধি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যে সে ইচ্ছা মত দশটা কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেও পাঁচটা কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছে না। কেন পারিতেছে না, কোন শক্তি তাহার এই সংকল্প সাধনের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া দেখিতে পাইবে যে তাহার অতিরিক্ত আর একটা শক্তি তাহার

দৈনন্দিন কার্য্য নিয়মিত করিতেছে। এই শক্তির খেলা প্রত্যক্ষ করিয়াই কবি গাইয়াছেন, "ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয় না সবাকার ইচ্ছোপরি ইচ্ছা আছে সন্দেহ কি আছে তার" "তুই যাত্রা করে দক্ষিণে যাস বামে ঘুরিস। কি কারণ তুই ভেবে দেখরে কর্ত্তা গোঁসাই আছেরে তোর আর একজন" যতই মানুষ এই শক্তির খেলা দেখিতে পায়, ততই নিজের শক্তির প্রতি সন্দিগ্ধ হইতে থাকে, এবং পরিণামে আপনার শক্তিরাহিত্য অনুভব করিয়া সেই মহাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই তত্ত্বজ্ঞানের নামই বিনয়। বিনয়ী আপনাকে দেখিতে পায় না যে সে সর্ব্বত্র মহাশক্তির খেলা প্রত্যক্ষ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া থাকে। যদি কেহ তাহার দৃষ্টি সে মহাশক্তি হইতে সরাইয়া লইয়া আপনার দিকে ফিরাইতে চায়, তাহা হইলে সে আশঙ্কিত চিত্তে তদ্বিধ শত্রু হইতে পালাইতে পারিলে নিরাপদ মনে করে।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারি।

প্রণয়ে প্রমাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বামী। গহনা গহনা কর কি আমি তোমার গহনা খেয়ে ফেলেছি নাকি?

স্ত্রী। ওকি কথা! যা দিয়াছ তুমি দিয়েছ আরত কেহই দেয় নাই। তবে এই যে তুমি এখন ভিন্ন সংসার করেছ। আমার খোরাক পোষাক ও মান ইজ্জতের রক্ষার জন্য সেগুলির নেহাত্ দরকার হয়ে পড়েছে। তাই চাচ্ছি দাও সেগুলি আমাকে দাও।

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া স্বামী কহিলেন,—চুপ কর চুপ্ কর।

স্ত্রী। চুপ করতে বল করছি কিন্তু—

স্বামী। আমার কাছে কিন্তু টিন্তু খাটবেনা বলছি। চুপ্ কর।

স্ত্রী। তবে কি গহনাগুলি আমাকে দিবে না? না খেয়েই আমাকে মরতে হবে?

স্বামী। চুপ্ কর বলছি।

স্বর্ণপদ্ম সেই খানে দাঁড়াইয়াছিল। সে এখনো বালিকা। এখনো সে বৃদ্ধ স্বামীর সম্মুখে অবগুণ্ঠন মুক্ত করিতে সাহস করে না। আজ সে একটু খানি মুখের কাপড় তুলিয়া একটু খানি সাহস করিয়া স্বামীকে কহিল। তুমি যে পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ বাবাকে দেখাইয়া আমাকে বিবাহ করেছিলে তার একখানি দিদিকে দাও না?

বালিকা স্ত্রীর মুখে এমন হিতকর ও সরল উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভয়ে স্বামীর অন্তরাত্মা শুষ্ক হইল। তখন তাহার মুখ দিয়া সত্য কথাই বাহির হইল। তিনি কহিলেন,—তাহা কি আমার ছিল? আমার মনিব কাগজের উপর আমার নাম লিখিয়া

ভাঙ্গাইতে দিয়াছিলেন। আমি সেই কাগজ তোমার বাবাকে দেখাইয়াছিলাম, নচেৎ তিনি আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতেন কি? আমি নির্ধন, তাতে বৃদ্ধ, তাই ঐ রূপে ধনী সাজিয়াছিলাম। স্বামীর কথা শুনিয়া বালিকা স্ত্রীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, আর ছুবুটী ঠাকুরাণীর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি স্বামীকে আর কিছু কহিলেন না, কাজ কি, হাজার হোক স্বামী। মনকে বুঝাইলেন, যাঁহাকে সেবা করিলে স্বর্গ হয়, তাঁহার উপর আমার রাগ কি?

এইভাবে দিন পনর অতীত হইল। কোনও সময় ছুবুটী ঠাকুরাণীর কোনও একটী কঠিন পীড়া হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শ মত তাহার স্বামী তাহাকে অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন করাইয়াছিলেন। আসামে আসার পর ছুবুটী ঠাকুরাণীর নিকট অহিফেন ছিল না এবং উহা সেবন না করায় ছুবুটী ঠাকুরাণীর অসুখ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, তিনি স্বামীর নিকট অহিফেন চাহিলেন। স্বামী আজকাল বলিয়া অহিফেন দিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে ছুবুটী ঠাকুরাণী একদিন আহারাদির পর খট্টার উপর উপবেশন করিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করিতেছিলেন। স্বামী গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—কৈ গো! এই তোমার অহিফেন লও।

ছুবুটী হস্ত তুলিয়া অহিফেন গ্রহণ করিলেন। অহিফেনের পরিণাম অতি অল্প, তিনি কহিলেন,—এত অল্প যে?

স্বামী। এইত খাও।

স্ত্রী। অহিফেন খাইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন এবং অহিফেন খাওয়ার পর অতি অল্পক্ষণই তাঁহার জ্ঞান ছিল। তহার পরই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন ও তাঁহার বিষম ধনুষ্টঙ্কার হইতে লাগিল।

বালিকা স্থলপদ্ম কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল, পরে ডাক্তারের জন্য চাকর পাঠাইল। ডাক্তার কবিরাজ ও অপরাপর লোক আসায় ঘর দরজা ভরিয়া গেল। মুহুর্মুহু ফিট হইতেছিল। কিন্তু অনেক ঔষধে ফিট কমিয়া আসিল। যখন জ্ঞানের সঞ্চার হইল, তখন রাত্রিদ্বি প্রহর। ছুবুটী ঠাকুরাণীর স্বামী গৃহে প্রবেশ করিয়া যেই দেখিলেন যে ছুবুটী ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মৃতকল্পা হইয়াছেন, অমনি তাঁহারও জ্ঞানলুপ্ত হইল ও ফিট হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলেন। এবং তিনি স্ত্রীকে বিষ খাওয়াইয়াছেন বলিয়া লোকে তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিল দেখিয়া তিনিও বলিয়া বসিলেন যে,—তাহার স্ত্রীই তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে। কি আশ্চর্য্য!! কে বলে স্বামী হিতকারী। স্থলপদ্ম স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"দিদির উপরে এ আপনার ভারি অন্যায়।"

স্বামী। আমি তোমাকে বড় ভালবাসি স্থলপদ্ম! তোমার জন্য আমি সবই করিতে পারি। ছুবুটী ঠাকুরাণী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিলেন। এবং এইরূপ

মনোমালিন্যের মধ্য দিয়া আরো একবৎসর অতীত হইল।

শারদবাবু শরীরের অসুস্থতানিবন্ধন চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। এবং কলিকাতায় ছোট একটী বাসা ভাড়া করিয়া স্ত্রীযুগলের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।

কলিকাতাতেই স্থলপদ্মের বাপ ছিল। শারদ স্থলপদ্মকে বাপের বাড়ী পাঠানর প্রস্তাবনা করিলেন এবং শ্বশুরবাড়ীর একজন ঝি পাঠাইতে লিখিলেন। স্থলপদ্মের পিত্রালয় হইতে একজন ঝি আসিল।

স্থলপদ্ম পিত্রালয়ে চলিলেন। স্বামী কহিলেন,—একজন ঝির সঙ্গে কি পাঠান যায়? অতএব তিনিও ধুতি চাদর পরিয়া স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিলেন, আর ফিরিলেন না। এক সপ্তাহ অতীত হইল। স্থলপদ্মকে রাখিয়া স্বামী আর বাসায় ফিরিলেন না। এই এক সপ্তাহের মধ্যে দুবুটী দুই দিন মাত্র খাদ্য জিনিস সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। আর ছয় দিন কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় অনাহারে অনিদ্রায়, শুধু স্বামীর প্রত্যাশায় কাটাইলেন। স্বামী আসিলেন না। এই সময় আবার বাড়ীওয়ালী ভাড়া চাহিয়া বসিল। তিনি কহিলেন,—বাছা! আমার কাছে ত এক পয়সাও নাই যে তোমাকে দিব।

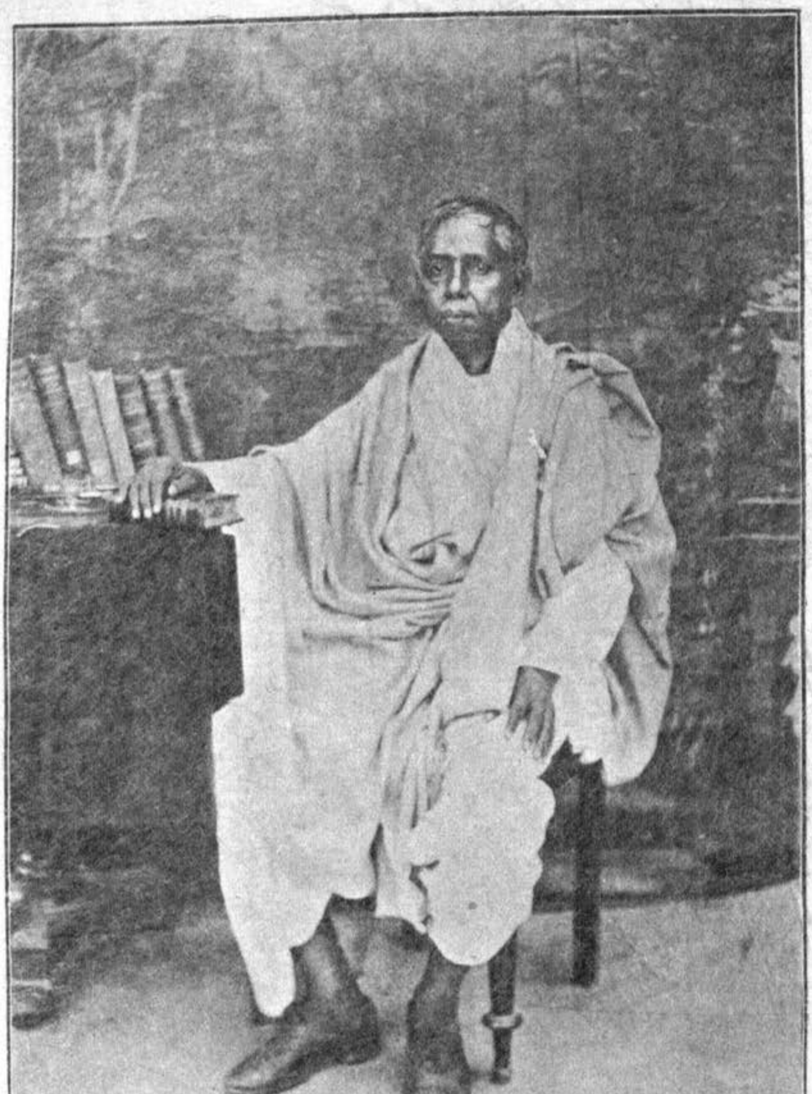
বাড়ীওয়ালী কহিল,—বাছা টাছা আমি মানিনা, টাকা দিবে কিনা বল? তোমার স্বামী বলে গেছেন যে তোমার কাছে বাসাভাড়ার টাকা রেখে গেছেন। দুবুটী ঠাকুরাণী অবাক্। কহিলেন, বাড়ীওয়ালী! ও সব মিথ্যা কথা। "মিথ্যা কথা বৈকি, বলিয়া বাড়ীওয়ালী দুবুটী ঠাকুরাণীকে যাহা মুখে আসিল তাই বলিয়াই গাল দিল। মার পিট করিব বলিয়া ভয় দেখাইল।

ছোটলোকের নিকট অপমানে দুবুটী ঠাকুরাণী অনেকক্ষণ বসিয়া কাঁদিলেন। তারপর উঠিয়া বোনপোর নিকট বিস্তারিত এক পত্র লিখিলেন। তাঁহার বোনপো বিনোদ বাবু কলিকাতাতেই ছিলেন।

বিনোদ বাবু পত্র পাইয়া মাসিমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুবুটী ঠাকুরাণী বোনপোকে সমুদয় জানাইলেন। বিনোদ বাবু বাড়ীওয়ালীকে বাসাভাড়া চুকাইয়া দিয়া মাসীমাকে লইয়া বাড়ী আসিলেন। ভদ্রলোকের মেয়েকে অপমান করার অপরাধে বাড়ীওয়ালীকে উত্তম মধ্যম কিছু দিতেও ভুলিলেন না।

দুবুটী ঠাকুরাণী কিছু দিন থাকিয়া, পরে পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। এবং কিছুদিন পিত্রালয়ে বাস করিয়া বৃদ্ধা জননীর সঙ্গে কাশী গেলেন ও সামান্য একখানি বাসা ভাড়া করিয়া কাশীবাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধা মাতা তাঁহাকে কোথা হইতে খাইতে দিবেন। অতএব তাঁহাকে দাসবৃত্তি ও পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইল। ওহো সময়ের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! পুরুষের প্রেমে ছি ছি ভুলিও না ভুলিও না

বরঞ্চ কুমারী হয়ে
থাক তার পথ চেয়ে



বামাবোধিনী পত্রিকার প্রবর্ত্তক

৺উমেশচন্দ্র দত্ত।

কিন্তু কখনো আঁখির পানে চাহিও না
চাহিও না।

শ্রীঅন্নদা সুন্দরী দাস গুপ্ত
গল্প ও ভাবভক্তি রচয়িত্রী।

ছবির প্রতি। *

ঐই সে জীবন্ত মূর্ত্তি হাসি হাসি মুখ,
দেবতার ভাব ওতে আছে প্রকাশিত ;
কি বলিছে ছবিখানি, মৃদু নাড়ি মুখ,
চক্ষু দুটী আমাপানে রাখি বিস্ফারিত !
কি বলিছ ভাবে ভাবে আমি বুঝি নাই,
কথাগুলি স্ফুট স্বরে বল প্রেমময়!
আঁখি ঠারি কি বলিছ শুনিবারে চাই,
কেহ নাই আমি মাত্র, কহ দয়াময়!
গভীর নিশার কথা না হবে প্রকাশ,
বল দেব! স্ফুট স্বরে ছলিও না আর ;
আমি ধন্য হব, মম জ্ঞান পরকাশ,
মৌন ভাব পরিহরি কহ একবার।
কত কথা বলিয়াছ শিক্ষা দান ছলে,
সশরীরে † যবে তুমি ধরা ধামে ছিলে ;
দয়াময় তুমি দেব, জানে ত সকলে,
কি ভাবে নীরব আছ উত্তর না দিলে!
এই দেখ তব কন্যা এ "বামাবোধিনী,
আছে মম ক্রোড়ে তব যতনের ধন,
অশ্রুনীরে তিতি কত কান্দে অভাগিনী,
পালিতেছি যত্নে একে করি প্রাণপণ।
কিন্তু যদি তব বাণী শুনিবারে পাই,
মণি মুক্তা রত্ন আনি দেশান্তর হতে,
মনের হরিষে একে যতনে সাজাই ;
বুঝিছ কি মম ব্যথা অন্তরীক্ষ হতে ?
শুন দেব! ব্যথা মম দয়াময় তুমি,
বল শক্তি হারা হই ভাবিবারে গেলে,
কিবা নাই, আছে সব. শুধু নাই তুমি,
শক্তি আসে স্ফূর্ত্তি আসে তব ভাব পেলে।
বল বা না বল কথা, ইঙ্গিতে প্রকাশ,—
"বল বা ভরসা তব না হবে অভাব,
রাখ বিভুপদে মতি, না হবে হতাশ,"—
এই কি বলিলে দেব, তব মনোভাব ?

শ্রীবিপ্রচরণ বসু

রমণীরত্নমালা।

(ব্রহ্মবাদিনী যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ী।)
মৈত্রেয়ী বাণি! ধন্যা তব দয়িতস্তুতা
স্বামিনো যাজ্ঞবল্ক্যাৎ
যা হিস্বাহনিত্যবস্তু ন্যমৃতময়পর—
ব্রহ্মবিদ্যামবাপ।

---

* বামাবোধিনী পত্রিকার প্রবর্ত্তক ৺ উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ছবিটী লক্ষ করিয়া উক্তি।
† সশরীরে অর্থাৎ শরীর ধারণ করিয়া।

যেনাহং নামৃতা স্যাং কথয় দয়িত ! যে
কিম্ কার্য্যং ততঃ স্যাৎ
ইথং যা ধারয়ন্তী পতিপদযুগলং
তেজসা ব্যাজহার ॥

—মৈত্রেয়ী তোমার কন্যা ধন্যা হে ভারতি !
ব্রহ্মবিদ্যা দিল যারে যাজ্ঞবল্ক্য পতি ;
অনিত্য সমস্ত বস্তু তৃণজ্ঞান করি,
সতেজে কহিলা সতী পতিপদে ধরি',
"না হ'ব অমৃতা আমি লভিয়া যে ধন,
হেন তুচ্ছ ধনে মোর কিবা প্রয়োজন ?"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার দুই পত্নী,—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। তিনি মৈত্রেয়ীকে কহিলেন, "কল্যাণি ! আমি এক্ষণে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিব, আমার গৃহ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী তোমাকে ও কাত্যায়নীকে বিভাগ করিয়া দিতেছি, গ্রহণ কর।" মৈত্রেয়ী কহিলেন, "ভগবন্ ! যদি এই সসাগরা বসুন্ধরা আমারি ভোগের জন্য সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণা হয়, আমি কি তাহাতে 'অমৃতা' (জরামরণাদি-তাপত্রয়-শূন্যা) হইব ? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—"না না, তাহা কদাচ সম্ভব নহে। ভোগোপকরণসম্পন্ন লোকদিগের জীবন যেরূপ হইয়া থাকে, তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে। বিত্তাদি বস্তু দ্বারা যে সকল কার্য্য হয়, তদ্দ্বারা সে অমৃত-বস্তু লাভের আশা মনে জ্ঞানেও করিতে নাই।" মৈত্রেয়ী কহিলেন, "নাথ ! যাহাতে আমি সে অমৃত-বস্তু লাভ না করিব, তাহা লইয়া আমি কি করিব ? অতএব হে নাথ ! আমাকে সেই ভূমামৃত-লাভের উপায় বলিয়া দিন।" তখন যাজ্ঞবল্ক্য সেই সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মামৃত-লাভের উপায়স্বরূপ সনাতনী ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ প্রশ্নোত্তররূপে বৃহদারণ্যকে যাহা বিবৃত আছে, তৎপাঠে ঐ দম্পতীর আধ্যাত্মিক মহিমার অপরিসীম উৎকর্ষের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(বেদসূক্তরচয়িত্রী ব্রহ্মবাদিনী আত্রেয়ী।)

আত্রেয়ী বিশ্বধন্যা সুরনরমহিতা
বেদসূক্তপ্রণেত্রী
ত্বগ্‌দোষামুক্তদেহাঽভবদমরপতিং
যা তপোভিঃ প্রসাদ্য।
নিষ্ঠ্যূতান্যাননেন্দোরমৃতরসপরিস্যন্দি—
সূক্তানি যস্যাঃ
ভক্ত্যা সংকীর্ত্তয়ন্তে পুলকিতহৃদয়া—
দেবসিদ্ধর্ষিসঙ্ঘাঃ ॥

—আত্রেয়ী অমর-নর-পূজিতা রমণী,
বেদসূক্ত-রচয়িত্রী বিদুষীর মণি ;
নিজ দেহে কুষ্ঠরোগ-আরোগ্যের তরে
বেদমন্ত্র রচিয়া পূজিলা সুরেশ্বরে ;
ধন্য তার মন্ত্র আর তপস্যার বল !
হৈল দেহ রোগমুক্ত দিব্য নিরমল।
আত্রেয়ী-বদনচন্দ্র হৈতে বিগলিত
সুধাময় দেবসূক্ত অতি সুললিত,
গান করে ভক্তিভরে দেব-ঋষিগণে,
সে সতীর পূজা করে পুলকিত মনে।

এই নারী অত্রিমুনির কন্যা বলিয়া আত্রেয়ী নামে পরিচিতা ; ইঁহার প্রকৃত নাম 'অপালা'। ইনি দৈবদুর্ঘটনায় কুষ্ঠ-রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এজন্য স্বামী

তাঁহাকে পরিত্যাগ করায়, আত্রেয়ী রোগ-মুক্তির জন্য পিতার আশ্রমে আসিয়া ইন্দ্রের কৃপালাভ জন্য, স্বরচিত সূক্তে সুরপতির স্তব করিয়াছিলেন। ইহাঁর সাধনায় ও ব্রহ্মবিদ্যায় সুরপতি প্রসন্ন হইয়া ইহাকে রোগমুক্ত করেন। ভবভূতিপ্রণীত উত্তর-রামচরিতে আত্রেয়ীনাম্নী এক বিদুষীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি সুদুর্গম দণ্ডকারণ্য অতিক্রম পূর্ব্বক, পুঁথি লইয়া মহামুনি অগস্ত্যের আশ্রমে বেদান্ত শিখিতে চলিয়াছেন। প্রথমে বাল্মীকির আশ্রমে গিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় ছাত্রের সংখ্যাধিক্য প্রভৃতি কারণে পাঠের অসুবিধা দেখিয়া অগস্ত্যমুনির নিকট যাইতেছেন। পথে বাসন্তীনাম্নী বনদেবীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, বাসন্তী তাঁহার যথোচিত আতিথ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি একাকিনী এ ঘোর দুর্গমারণ্য অতিক্রম করিয়া কোথা যাইতেছেন? আত্রেয়ী বলিলেন;—

"অস্মিন্নগস্ত্যপ্রমুখাঃ প্রদেশে
ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং
বাল্মীকিপার্শ্বাদিহ সঞ্চরামি॥"

—এ দণ্ডকারণ্য প্রদেশে অগস্ত্যপ্রমুখ বহু ব্রহ্মবিৎ মহর্ষিগণের বাস। তাঁহাদের নিকট বেদান্তবিদ্যা শিখিবার জন্য আমি বাল্মীকির নিকট হইতে এ স্থানে ভ্রমণ করিতেছি। আহো আত্রেয়ি! ধন্য তোমার সাহস! ধন্য তোমার ব্রহ্মসাধনায় দৃঢ়তা! এক্ষণকার বামাগণ যদি একবার প্রাচীন ভরেতের বামাগণের চরিত্রে দৃষ্টিপাত করেন, নিশ্চয় তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে।

(বীরাঙ্গনা বিদুলা।)

ধন্যা সা বিদুলা প্রবীররমণী—
সীমন্তমুক্তামণিঃ
যস্যা নীত্যনুশাসনং মৃতমপি
প্রোদ্দীপয়েৎ তেজসা।
নিত্যং যচ্চরিতাদ্ভুতং সপুলকং
শৃণ্বন্তি বীরাঙ্গনাঃ
বীরাপত্যললামলাভমনসঃ
শ্রদ্ধান্বিতেনাত্মনা॥

—ভারতের বীরনারীকুলশিরোমণি
ধন্যা সে বিদুলা দেবী ক্ষত্রিয়রমণী!
তাঁর সে শাসননীতি শ্রবণ করিয়া
মৃতও অদম্য তেজে উঠে গরজিয়া;
ক্ষত্রনারী বীরপুত্র-রত্নলাভ তরে
সপুলকে সে কাহিনী শুনে শ্রদ্ধাভরে।
রিপুগণহৃতরাজ্যং দীনহীনং হতাশং
স্বতনয়মিব বিদ্যুত্তেজসোৎসাহবাচা।
রিপুকুলদলনে যোদ্দীপয়ন্তী স্বরাজ্যং
পুনরপি রিপুহস্তান্মোচয়ামাস বামা॥
—রিপুগণে রাজ্য তার করিলে হরণ,
পুত্র তার হৈল ঘোর বিষাদে মগন;
মৃতকল্প ভূপতিত তনয়ে হেরিয়া,
তেজস্বিনী রাণী রোষে উঠিল গর্জ্জিয়া;
বিদ্যুৎ ঝলসে যেন বচনে বামার,
শুনি তাহা মহাতেজে উঠিল কুমার;
সঞ্জীবনী মাতৃনীতি শুনিয়া তনয়,
উদ্ধারিল হৃত রাজ্য শত্রু করি' জয়।
রাজপত্নী বিদুলার পতি স্বর্গারোহণ

করিলে, তদীয় রাজ্য প্রবল শত্রুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইল। বিদুলা একমাত্র পুত্রকে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র নৈরাশ্যে ও বিষাদে শয্যাশায়ী হইলেন। পুত্রের সেই শোচনীয় দশা দর্শনে, তেজস্বিনী বিদুলা পুত্রকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলেন ;—কাপুরুষ! পামর! তুমি কি আমার গর্ভে এবং সেই বীরসিংহের ঔরসে জন্ম গ্রহণ কর নাই? কি জন্য বজ্রাহত শবদেহবৎ ধরাশায়ী হইয়াছ? হা হতভাগ্য! শত্রুরূপ বিষধরের বিষদন্ত উৎপাটন না করিয়া, তুমি শূকর কুক্কুরাদির ন্যায় মরিতে চাও? বিলুপ্ত কীর্ত্তিকে নিজভুজবীর্য্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর। তোমার নাম যেন জগতের বীরবর্গের নামের মধ্যে বা অন্তে পরিগণিত না হয়। যদি সর্ব্বাগ্রেই তোমার নাম সগৌরবে কীর্ত্তিত না হয়,, তবে জানিব, আমি বন্ধ্যা। তুষাগ্নির ন্যায় চিরকাল ধূমাচ্ছন্ন ভবে থাকা অপেক্ষা তৃণাগ্নির ন্যায় ক্ষণমাত্রও প্রজ্জলিত হইয়া, শত্রুহস্তে নিধন লাভ শ্লাঘার কথা। যাহার বীরবংশে জন্ম, সে যদি যুদ্ধে একটী শত্রুকেও সংহার করিয়া মরে, তবে সে ধর্ম্মের নিকট অঋণী, সে তাহার জননীর শোককারণ নহে। দেখ পুত্র! তোমার কাপুরুষতায় তোমার পিতৃবংশের সমস্ত কীর্ত্তি লোপ পাইতেছে, তুমি ক্লীবের ন্যায় ধিক্কৃত জীবনভার কিরূপে বহন করিতেছ? অদম্য উৎসাহে সিংহের ন্যায় ভীম পরাক্রমে উত্থিত হও! বল, বীর্য্য, ধৈর্য্য ও সাহস ধারণ কর, ব্যসনময় এ রাজবংশকে উদ্ধার কর, কোটি কোটি প্রজার নয়নাশ্রু ক্ষালিত কর। এ পতিত রাজবংশকে উদ্ধার কর। সর্ব্বলোক যাহার লোমহর্ষণ পৌরুষের কথা কীর্ত্তন না করে, তাহার নাম কেবল লোকসংখ্যার পূরণমাত্র। দানে, তপস্যায়, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, বিদ্যায় ও অর্থলাভে যাহার নাম বিঘোষিত না হয়, সে তাহার মাতার মলমূত্রসদৃশ। যে ব্যক্তি জ্ঞানে, মানে, সম্পদে ও পরাক্রমে সকলকে পরাভূত করিতে পারে, তাহাকেই পুরুষ বলে। যাহার উৎসাহ নাই, উচ্চ কামনা নাই, বল-বীর্য্য-পরাক্রম নাই, বিপৎপ্রতীকারের ক্ষমতা নাই, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান নাই, তাদৃশ নরাধম কাপুরুষকে যেন কোনও ক্ষত্রিয় নারী গর্ভে ধারণ না করে। যদি দুষ্কর কার্য্য সাধনের ক্ষমতা না রহিল, তবে ক্ষত্রিয়নামের গৌরব কোথায়? উঠ! উঠ! হৃদয়কে লৌহবৎ সুদৃঢ় কর ; শত্রুগণের মস্তক আক্রমণ করিয়া যদি তুমি ক্ষণমাত্র প্রজ্জলিত হইয়াই নিহত হও, তোমাকে আমি চিরজীবী জ্ঞান করিব।

ক্রমশঃ

নূতন সংবাদ।

১। গত ৫ই জুলাই ঝান্সি বিধবা-বিবাহ সমিতির উদ্যোগে সাগর জেলার

ছত্রীজাতীয়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী পিয়ারী দেবীর সহিত হাসিয়ারপুর জেলার ভোলারাম আহলোয়ালার পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। লাহোরের অনেক গণ্য মান্য ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান ও হিন্দুবিধবার দুঃখক্লেশ বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ নারায়ণ গঞ্জে প্রসিদ্ধ ধনী সওদাগর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ধর্ণ মহাশয়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনীর সহিত কলিকাতা বরাহনগরনিবাসী মহেন্দ্রনাথ সরকারের পুত্র বাবু বিজয়কৃষ্ণ সরকারের বিবাহ হইয়াছে। ঢাকা জেলার অনেক সম্রান্ত ব্যক্তি এই বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন।

বামারচনা।

দেবনিবাস। *

১

সে দিন গেছিনু আমি সে দেব নিবাসে
সে নিবাসে যে দেবতা,
বঞ্চিতেন সরবদা,
খেলিত দেবের শিশু উৎসাহ উল্লাসে।

২

সেদিন গেছিনু সেই দেব-নিকেতনে
দেখিনু আঁধার ভরা,
চাঁদ নাই আছে তারা,
ফুল নাই গন্ধটুকু বহিছে গোপনে।

৩

সে দিন গেছিনু সেই অমর নগরে
দেখিনু অমর শূন্য,
জমাট রয়েছে পুণ্য,
সুখশূন্য শান্তি আছে, ম্লান মূর্ত্তি ধরে।

৪

সে দিন গেছিনু সেই পবিত্র আশ্রমে
যে আশ্রমে যোগিবর*
বঞ্চিতেন নিরন্তর,
বহিত মন্দার-গন্ধ পলাশ কুসুমে।

৫

দেখিনু সে পুণ্যাশ্রম হয়েছে আঁধার,
গোটাকত মধু-ফুল
হয়ে আছে শোকাকুল
অন্তরীক্ষ হতে উঠিতেছে হাহাকার।

৬

সে দিন গেছিনু আমি সেই সে স্বরগে
যে স্বরগে দান, ধর্ম্ম,
সত্য, দয়া, ক্ষমা, কর্ম্ম,
বহে সুখ-শান্তি সিন্ধু-খরতর বেগে।

৭

দেখিলাম ভগ্ন হয়ে গেছে স্বর্গ-ধাম,
নাই আর সে সৌন্দর্য্য,

*৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়

*৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহ, কলিকাতা।

বল নাই, নাই বীর্য্য,
দেবতা গেছেন চলে আছে তার নাম।

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী

সংসার খেলাঘর।

১

আমার এ খেলা ঘর দুদিন তরে।
খেলা হ'লে চলে যাব আপন ঘরে।
মার ছেলে মারে ফেলে, আসিয়াছি পথ ভুলে
মা আছেন পথ চেয়ে আমার তরে,
আমি গেলে কোলে নেবে আদর ক'রে।

২

সাজায়ে মা পাঠাইলা খেলার তরে।
"যেও নাক দূরে বাছা" কহিলা মোরে।
"বহু দূরে বহু ভয়, যদি পথভ্রান্ত হয়
কেমনে আসিবি তবে আমার কোলে?
দূরে গেলে পরে বাছা! পড়িবি গোলে।"

৩

মার কথা নাহি শুনে আজি এ দশা!
বড় ভয় সংসারেতে খেলিতে বসা।
কি ছাই খেলিতে এনু শুধুই হারিয়া গেনু
এই খেলিবার তরে সংসারে আসা;
খেলা হায়, এ যে দুঃখসাগরে ভাসা।

৪

খেলিতে কাঁদিয়া চ'খ হয়েছে আঁধা;
পাইনেকো পথ খুঁজে লাগিছে ধাঁধা।
আয় গো মা ত্বরা করে, কোলে ক'রে নেযা মোরে
অবোধ তনয়া তব শোনেনি কথা;
তা ব'লে কি মার প্রাণে বাজেনা ব্যথা?

৫

সারাদিন খেলিলাম কি ছাই খেলা।
যার তরে কাঁদে প্রাণ সাঁজের বেলা।
পড়িয়াছি যে খেলায়, মিটিবে কখন হায়!
কে জানে যাইতে পাব কখন তথা?
পথ চেয়ে স্নেহময়ী মা আছে যথা।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

তরঙ্গিণী।

নেচে নেচে কোথা যাও ওগো তরঙ্গিণি!!
হৃদয়ে অনন্ত প্রেম, ভক্তিপ্রবাহিণী।
শিখিয়াছ কার কাছে ও গভীর তান?
ভক্তির প্রবাহ তানে বিশ্ব কম্পমান।
কল কল তানে গাও মহিমা কাহার?
কে জানে হৃদয় তব মহৎ অপার!!

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়
নিলফামারী

২০।০ মদন মিত্রের লেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

BENG